প্রবন্ধ

বড়দিন:শুধুই ২৫ ডিসেম্বর!

স্যামুয়েল পালমা

"জেরুশালেম হচ্ছে তিন বড়দিনের শহর" (the city of Three Christmases), অল্প এ কটি শব্দ ভাবসম্প্রসারণ করলেই আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে যে যিশুর জন্মভূমির যেমন, তেমনি পুরো বিশ্বের খ্রিস্টানগণও শুধুই ২৫ ডিসেম্বরকেই বড়দিন বলছে না বা পালন করছে না। আর অবাক হবার মতই-যিশুর জন্মস্থল বেৎলেহেম, নাজারেথ, জেরুশালেমে বড়দিন পালিত হয় কোন একটা নির্দিষ্ট দিনে নয়, বরং পুরো টানা দুই মাস ব্যাপী। আর সেই পবিত্র স্থান শুধুই কাথলিকগণ তথা আমরাই পরিচালনা করি না, বৃহত্তর খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সকল বিভাজনের নেতা-নেতৃবর্গ একত্রে এবং সমবেতভাবে তার মর্যাদা রক্ষা ও পবিত্রতার সকল নিয়মকানুন অক্ষুন্ন রেখেই তা পরিচালনা করছে। কাথলিক এবং প্রটেষ্টান্টগণ বড়দিন পালন করে ২৫ ডিসেম্বর, অর্থডক্সগণ পালন করে ৬ জানুয়ারি আর আর্মেনিয়ানগণ বড়দিন পালন করে ১৮ জানুয়ারি। এক মাসে তিন বড়দিন! সেজন্যই এ শহরকে বলা হয় তিন বড়দিন-এর শহর। তবে বড়দিন পালিত হয় পুরো দু'মাস ব্যাপী, অত্যন্ত ভাব গাম্ভির্য এবং পবিত্রতার মধ্যে।

বিশ্বে কয়েকটা ক্যালেন্ডার অনুসরণ করার কারনেই মূলত বড়দিনের তারিখ নির্ধারণ করতে একটা ঝামেলা পোহাতে হয়। তারিখের অসামঞ্জস্যতার দিকে গুরুত্ব দিয়েই যিশুর জন্মস্থান জেরুশালেমে সকল মণ্ডলী ঐক্যমতে পৌঁছায় যে, যিশুর জন্মদিনকে কোন নির্দিষ্ট দিন ধরা হবে না, এটা হবে একটা জন্মদিন মৌসুম। যিশুর জন্মদিন উদ্‌যাপনের মৌসুম হবে ২০ নভেম্বর থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত যেখানে সব তারিখের অনুসারীরাই অন্তর্ভূক্ত হয়। মুসলিম দেশে এটা বুঝানোও সহজ নয় যে বিশ্বে সকল উদ্‌যাপনের উর্ধ্বে এবং কেন্দ্রিয় ব্যক্তি হচ্ছেন যিশু আর তিনি ছাড়া আর কারো জন্মদিন এত জাঁকজমকভাবে পালিত হবার নয়।

পুরো বিশ্বে বড়দিনের মৌসুমের প্রতিটি অংশকেই বড়দিনের অংশ হিসাবেই গ্রহণ ও পালন করা হয়। বিশ্বব্যাপী যে সকল অনুষ্ঠানগুলো এই বড়দিন মৌসুমে অন্তর্ভূক্ত মূলত সে সকলেরই একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে তুলে ধরতে চাই। তারিখ অনুসারে বিশ্বে বড়দিন মৌসুমের উদ্‌যাপনগুলো পর্যায়ক্রমে পালিত হয় এভাবে-

(১) সেপ্টেম্বরের শুরু থেকেই ফিলিপিন্‌স-এ বড়দিন উপলক্ষে ক্যারাল বা কীর্তন শুরু হয় এলাকা থেকে এলাকায়।

(২) নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবারে আমেরিকাতে থেংক্‌স গিভিং ডে'র পরের শুক্রবার ব্লেক ফ্রাইডে থেকেই সেখানে বড়দিনের কেনা-কাটার ধূম পরে যায়।

(৩) ডিসেম্বরের এক তারিখ থেকেই বিশ্বের সকল খ্রিস্টান দেশগুলোতেই সাজ্ সাজ্ রব চলে। প্রকৃতিতে এবং মানব পরিবেশে বড়দিন বড়দিন আমেজ বিরাজিত হয়।

(৪) ৬ ডিসেম্বর-থেকেই বৃটেন সহ অনেক পশ্চিমা দেশ শিশুভক্ত সাধু নিকোলাসের পর্ব পালনের মাধ্যমে বড়দিনের আড়ম্বরে প্রবেশ করে। এই সাধু নিকোলাসই আমাদের বড়দিনের সান্তা ক্লজ।

(৫) ৮ ডিসেম্বর -ইতালী সহ অনেক দেশই অমলোদ্ভবা মা-মারীয়ার পর্ব বা মা-মারীয়ার পবিত্র গর্ভধারণ পর্ব থেকেই বড়দিনের জাঁকজমকে প্রবেশ করে। ইতালীতে 'প্রিসেপে' অর্থাৎ গোশালা সাজানো শুরু হয় এদিন। শিশু যিশুর সঙ্গে মা-মারীয়া, সাধু যোসেফ, থাকে একটা গাধা ও একটি হাঁসের মূর্তি এবং অন্যান্য মূর্তিও, সেই গোশালায়। ক্রিসমাস ট্রি-ও সাজানো হয় এদিন থেকেই।

(৬) ১২ ডিসেম্বর - মেক্সিকোতে 'লা গুয়াদা লুপানো' নামের বিশেষ ভোজ দিয়ে তারা বড়দিন মৌসুম শুরু করে।

(৭) ১৩ ডিসেম্বর - ইতালী সহ অনেক খ্রিস্টান দেশই সেন্ট লুসিস ডে' আড়ম্বরের সাথে পালন করে। ইতালীর উত্তরাংশে সিসিলিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তা পালিত হয় আর পুরো ইতালীতে সেদিন কোন আটার তৈরী খাবার খাওয়া হয় না।

(৮) ১৬ ডিসেম্বর - বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই এদিন থেকে বড়দিনের নভেনা শুরু হয়। ফিলিপিন্‌সে তা খুবই ভাবগাম্ভির্যপূর্ণভাবে পালিত হয়। মেক্সিকোতে এদিন থেকে রাতের বেলা দলবেঁধে খ্রিস্টানগণ বাড়ি বাড়ি দরজায় আঘাত করে এবং কিছু সময় অতিবাহিত করে, কখনও প্রার্থনায় কাটায়। তারা স্মরণ করে প্রসব বেদনা নিয়ে মা-মারীয়া ও সাধু যোসেফের সেই রাতে যিশুর জন্মস্থান খোঁজার কথা।

(৯) ২২ ডিসেম্বর - স্পেনে জাক্‌জমক লটারী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রিসমাসের আনন্দে ও আড়ম্বরে প্রবেশ করে। 'স্পেনিস ক্রিসমাস লটারী' অনুষ্ঠানটি তারকা খচিত জম্-জমাট গান এবং কনসার্টের মাধ্যমে লাইফ টিভিতে প্রচারিত হয় এবং প্রত্যেক পরিবার লটারী ধরে টিভির সামনে বসে অপেক্ষা করে, দেখতে কে বা কারা সে বছরের সেরা ভাগ্যবান নির্বাচিত হচ্ছে।

(১০) ২৪শে ডিসেম্বর - ক্রিসমাসের সেই মহা আরম্ভরের সন্ধ্যা যা খ্রিস্টান দেশগুলোতে 'ক্রিসমাস ইভ' (বড়দিন পূর্ব সন্ধ্যা) (ঢাকাইয়া ভাষায় কচুদার সন্ধ্যা) নামে বহুল পরিচিত। ধর্মীয়ভাবে এ সন্ধ্যায় গোশালায় যিশু, মা-মারীয়া, সাধু যোসেফ ও অন্যান্য মূর্তি স্থাপন করা হয়। মধ্যরাতের মিশার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলে। ক্রিসমাস ট্রিকে গুরুত্ব দিয়ে তার নিচে শিশুরা জুতা রাখে উপহার পাবার জন্য। অনেক দেশে শিশুরা শান্তা ক্লজকে চিঠি লেখে, কোথাও আবার বাবা-মা'র উদ্দেশে শিশুরা চিঠি লেখে ও ক্রিসমাস ট্রি'র নিচে রাখে। এ সন্ধ্যায়ই সান্তা ক্লজ জুতার ভিতর অনেক অনেক উপহার বিতরণ করে। ক্রিসমাস-এর মূল ভোজ বা পার্টি হয় বেশির ভাগ দেশেই এ সন্ধ্যায় মিশার পূর্বে, তবে ব্যতিক্রম শুধুই ফ্রান্সে, তারা মিশার পর গভীর রাতে এ ভোজে অংশগ্রহন করে। যুবক-যুবতীরা, শিশুরা আনন্দে মিলিত হয় এলাকায় এলাকায় বড় অগ্নি উৎসব করার জন্য, অনেক জায়গায় গির্জার পাশেও এই অগ্নি উৎসব হয়ে রাতের মিশায় অংশগ্রহণ করে। অনেকের বিশ্বাস শীতে যিশুর পা গরম রাখার জন্য এই আগুন জ্বালানো হয়। আর্জেন্টিনাতে

প্রচুর ফানুসে আকাশ ছেয়ে যায় যা শিশু ও যুবক-যুবতীদের আনন্দের বিরাট একটা বিষয়। বেথলেহেমে এদিনে অনুষ্ঠিত হয় জনাকীর্ণ এক শোভাযাত্রার যেখানে প্রায় ৩০ হাজার খ্রিস্টভক্ত শহরের বিস্তৃত এলাকা প্রদক্ষিণ করে। ইতালীতে এদিন থাকে মাংসাহার ত্যাগ, তবে থাকে মাছের নানা পদের খাদ্য-উৎসব। তাছাড়াও এ সন্ধ্যাকে ঘিরে বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টানদের মধ্যে থাকে উপহার প্রদান সহ নানা বিধ উৎসবের ঘনঘটা, আয়োজন।

(১১) ২৫ ডিসেম্বর - কাথলিক ও প্রটেষ্টান্ট দেশগুলোতে খ্রিস্টভক্তগণ আড়ম্বরের সাথে যিশুর জন্মদিন উদ্‌যাপন করে। খ্রিস্টভক্তগণ ছাড়াও এদিন থাকে ক্যারল বা কীর্তন সহ নানা বিধ অনুষ্ঠান ও খাদ্যোৎসবের আয়োজন। ইউরোপে এই দিনটিকে পারিবারিক মিলন উৎসব, সুখ ও আনন্দ উৎসব এবং ঐক্যের সুবর্ণ সময় হিসাবে গ্রহণ করে এবং পরিবারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

(১২) ২৬ ডিসেম্বর - সাধু ষ্টেফানের পর্ব এবং বড়দিনের রেশ হিসাবে অনেক খ্রিস্টান দেশেই সরকারী ভাবে ছুটি থাকে। অষ্ট্রেলিয়াতে এদিন থাকে বক্সিং ডে' এবং সরকারী ছুটি। আরও অনুষ্ঠিত হয় ইয়ট রেস বা পালতোলা নৌকার প্রতিযোগিতা আর জাতীয় পর্যায়ে নানাবিধ খেলার আয়োজন।

(১৩) ২৮ ডিসেম্বর - হলি ইনোসেন্ট ডে' যা বাংলা করলে 'পবিত্র/নিরীহ বা সরলদের দিবস'। এটা পালিত হয় 'এপ্রিল ফুল' বা আমাদের 'ঠকানোর দিন'-এর মত করে। শিশু যিশুকে মারতে গিয়ে দুষ্ট হেরোদ কর্তৃক নিরীহ শিশু হত্যা স্মরনে এই দিনটি পালিত হয়।

(১৪) ৩১ ডিসেম্বর - 'ক্রিসমাস ইভ'-এর মত এ দিনটিও অনেক খ্রিস্টান দেশগুলোতে 'নিউ ইয়ার ইভ' নামে পরিচিত যেদিন যুবক-যুবতীরা বাদ্য-বাজনা, কনসার্ট, ঘোরাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, -নানাবিধ আনন্দে মিলিত হয়। অনেক দেশেই শেষ ১২ সেকেন্ডে ১২টি আঙ্গুর খেতে পারলে সে হবে পরবর্তী ১২ মাসের জন্য সৌভাগ্যবান আর বিফলে দুর্ভাগ্য -এ বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

(১৫) ১ জানুয়ারী - নিউ ইয়ার বা খ্রিস্টীয় নতুন বছর উদ্‌যাপন বিশ্ব ব্যাপী একটি সংস্কৃতি যা খ্রিস্টান দেশগুলোতে যেমন, আজকাল তেমনি সাড়া বিশ্বে বিস্তৃত। দিনটি মূলত বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে আনন্দের দিন হিসাবে দেখা হয়। ঘোরা-ফেরা, খাওয়া দাওয়া, কনসার্ট, শিকার, -নানাবিধ আয়োজন থাকে এ দিনটিকে ঘিরে।

(১৬) ৫ জানুয়ারি - 'ইপিফানি ইভ' যা ইপিফানি ডে'র পূর্ব সন্ধা হিসাবে পালিত হয়। এদিনটিতে শিশুদের প্রচুর উপহার দেওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। এমনকি তারা বড়দিনের চেয়ে বেশি উপহার পায় এদিনে। শিশুরা তাদের জুতা-মোজা পরিষ্কার করে বারান্দায় বা বেলকনিতে রাখে যেন রাজা তাদের উপহার দিয়ে যায়। এমনকি তাদের প্রিয় উপহারের কথা তারা চিঠিতেও লিখে জুতার ভিতর রাখে। রাজার জন্য তারা একগ্লাস দুধ, কিছু বাদাম ও ১টি কমলাও রাখে। রাজাকে বহনকারী গাধার জন্য রাখে ১ বালতি পানি। বড়রাও অনেক আনন্দের সাথে এ সন্ধ্যা উদ্‌যাপন করে।

(১৭) ৬ জানুয়ারি - ইপিফানি ডে' (Epiphany Day)-তে পূর্ব দেশের তিন রাজা যিশুর কাছে এসে তাকে প্রণাম ও উপহার প্রদান করেছিলেন। ১) ইথিওপিয়ার রাজা **গেসপার** যিনি দিয়েছিলেন ধূপ, ২) আরব দেশের রাজা **মেলকিয়র** যিনি দিয়েছিলেন সোনা আর ৩) মিশরের রাজা **বেলথে জার**, যিনি উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন গন্ধরস। সেদিন সকল খ্রিস্টান দেশেই তিন রাজাকে নিয়ে অবিকল আমাদের ১ বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রার মত শোভাযাত্রা হয় শহর থেকে শহরে।

(১৮) ৭ জানুয়ারি - ইরিত্রিয়াতে এদিন বড়দিন পালিত হয়। ইথিওপিয়ানগণ ইথিওপিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে এদিনটিতে যিশুর জন্মদিন পালন করে। অনেকে শুনে হয়তো অবাক হবেন যে ১৩ মাসে বছর আছে, আর তা এই ইথিওপিয়ান ক্যালেন্ডার। আমাদের, গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারীদের সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ ইথিওপিয়ান ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস 'মাসকারেম' (Maskarem) মাস শুরু হয়।

(১৯) ১৮ জানুয়ারি - আর্মেনিয়ানগণ আর্মেনিয়ান ক্যালেন্ডারের অনুসরণ ক'রে এদিন যিশুর জন্মদিন পালন করে। এই দিনটি আর্মেনিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে ২৫ ডিসেম্বর হয়।

(২০) ১৯ জানুয়ারি - জেরুশালেমে আর্মেনিয়ান অর্থডক্সগণ বড়দিন পালন করে তাদের ক্যালেন্ডারের জানুয়ারির ৬ তারিখ যা 'আমাদের' জানুয়ারির ১৯ তারিখ হয়

এভাবেই শেষ হয় যৌথ সিদ্ধান্তের দুই মাস ব্যাপী ক্রিসমাস সিজন বা বড়দিন মৌসুম উদ্‌যাপন। বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টান দেশগুলো যে আড়ম্বরে যিশুর জন্মদিন বা বড়দিন উদ্‌যাপন করে তা আমাদের মত ধর্মীয় সংখ্যালঘু দেশে থেকে পালনে ভিন্ন হবে, তা খুব অস্বাভাবিক নয়। তবে আমরা ক্রমেই সেই চর্চাগুলো অনুসরণ করবো এবং একই ধারায় উদ্‌যাপনে একই আনন্দের সামিল হবো সেই প্রত্যাশায় সামনে এগিয়ে যেতে পদক্ষেপ নেয়া মঙ্গলকর। তবে ক্রমোন্নতিশীল অর্থনীতি আমাদের এই সমস্ত জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবগুলো পালনে ক্রমেই আমাদের অভ্যস্ত করবে। আর এই সমস্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে নানাবিধ আনন্দের সমাহার আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে আলোর পথ দেখাবে বলেই আমার আস্থা ও বিশ্বাস॥

কৃতজ্ঞতাস্বীকার: ইন্টারনেট

শ্রী যিশুর জন্মদিন

সিস্টার কাকন রোজারিওআরএনডিএম

শ্রী যিশুর এই জন্মদিনে আনন্দেতে মাতি,
তাঁরই সঙ্গে মিলিত হতে
আমরা সবাই আসি।
গভীর রাতে অন্ধকারে উঠেছে নবতারা,
তাই দেখে রাখালেরা হয়েছে আত্মহারা।
তিন পণ্ডিত এসেছিলেন যিশুর কথা শুনে,
সোনা-রূপা- গন্ধক দিলেন তাঁরই চরণে।

শীতের এই হিমেল হাওয়া বইছে
চারিদিকে,
ধনী-গরিব সবাই মিলে ছুটছে
গির্জার দিকে।
যিশু এলেন মোদের মাঝে
মুক্তি দিতে তাই,
তাঁরই দিকে চলতে মোরা
আমরা সবাই চাই॥

আসন্ন বড়দিন ও ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষ্যে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী এর পাঠক-পাঠিকাসহ সকলকে কারিতাস জানাচ্ছে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

- কারিতাস অর্থ "দয়ার কাজ" বা "সার্বজনীন ভালবাসা"।
- কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ এমন একটি সমাজ বিনির্মানের স্বপ্ন লালন করে, যে সমাজ মুক্তি ও ন্যায্যতা, শান্তি ও ক্ষমাশীলতার মূল্যবোধসমূহকে ধারণ করে এবং সবাই মিলে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্মানের সাথে মিলন সমাজে বসবাস করে।
- কারিতাস বাংলাদেশ মানুষের সহযোগী হতে চায়; বিশেষত: সেইসব মানুষের- যারা সমাজে গরীব ও প্রান্তিক জীবনাবস্থায় আছে। সবার প্রতি সম-মর্যাদার দ্বারা কারিতাস এমন একটি সমন্বিত উন্নয়ন অর্জন করতে প্রয়াসী যার লক্ষ্য হলো: মানব-মর্যাদা নিয়ে মানুষ সত্যিকার মানুষের মতো জীবন যাপন করবে এবং অপরকে দায়িত্বশীলতার সাথে সেবা করবে।
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাস সকল মানুষের সাথে কাজ করে।

কারিতাস বাংলাদেশ
২ আউটার সার্কুলার রোড
শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

Congratulations

Congratulations to our dedicated daughter who completed her Bachelor's Degree in Biological Sciences from The University of Maryland this year. She is a medical professional working in Obstetrics and Gynecology and General Surgery, and is aspiring to become a Physician's Assistant (P.A.) next year. She is an Odissi dancer who has been under the instruction of Smt. Sukanya Mukherji for the past 13 years and counting. She will be having her Manchapravesha (Dance Graduation) in Summer 2022. Rakhi is the granddaughter of the late Benedict & Margaret Rozario (Bora Golla- Nutan Fakir Bhari), and Hubert & Shanti D'Cruze (Poran Tuital- Cruze Bhari). Thank you for your generous and humble blessings!

With love

Clement Sandip & Teresa Shilpi Rozario
[Baba and Ma]
Germantown, MD, USA

PAUL ROZARIO

BORN: 26 AUGUST 1934
DEATH: 07 JANUARY 2013

MEMORIAL OF PAUL ROZARIO 2021

Let's remember again departed soul of **Paul Rozario**. Who's legendary life enlighten our family and community greatly to flourish.

Paul Rozario departed mortal earth to heaven 9 years before but his spirit still existing among us forever.

As our family successor our humble respect and love to The great Paul Rozario.

With love

Wife: TERESA ROZARIO
SON: DOMINIC ROZARIO (শিল্পী)
SON'S WIFE: TRIPTI JACKLINE ROZARIO
GRAND SON: ALEXANDER PAUL ROZARIO
GRAND DAUGHTER: JANE ROZARIO
SON: ALOYSIUS ROZARIO (শিমুল)
SON'S WIFE: SCOLASTICA M. ROZARIO
GRAND SON: VICTOR C. ROZARIO
GRAND SON: CORNELIUS A. ROZARIO
SON: CLEMENT ROZARIO (সমর)
GRAND DAUGHTER: SAMANTHA ROZARIO

স্বর্গীয়া রোজমেরী গোমেজ

জন্ম ঃ ২২ আগষ্ট ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু ঃ ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

অনন্তলোকে ৩য় বৎসর

"..... তারা আর মরতে পারেনা; কারণ তারা স্বর্গদূতদের মতো মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছে বলে তারা ঈশ্বরের সন্তান।" (লুক- ২০:৩৬)

শান্তি, মহা শান্তির মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছ।

তোমার আনন্দভরা, ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়খানি নিয়ে তুমি আছ প্রেমময় ঈশ্বরের অনন্ত রাজ্যে। প্রতি ক্ষণে মনে পরে তোমার প্রেমপূর্ণ ভালবাসা, ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় আছ তুমি মোদের মাঝে। জাগতিকভাবে থাক না তুমি, থাক হৃদয় মাঝে, হৃদয় পূর্ণ করে। রব যতদিন ধরা-তলে ভুলিব কেমনে তোমারে, তুমি যে হৃদয় জুড়ে।

বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি তুমি পরম পিতার কাছে আছ। আমরা যেন তোমার আদর্শ লালন করে চলতে পারি। জীবন শেষে আমরা যেন তোমার সাথে পরম করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্ত বিশ্রাম পাই। তোমার আত্মার চিরশান্তি কামানায়-

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্বামী ঃ ফিডেলিচ গোমেজ
বড় ছেলে- ছেলে বউ ঃ থিয়টনিয়াস লেকাভালিয়ার গোমেজ
মেরী গ্লোরিয়া রোজারিও
মেয়ে ও মেয়ে জামাই ঃ মেরী ফ্লোরেন্স গোমেজ (মুক্তা)
খ্রিস্টফার রোনাল্ড গোমেজ (রকি)
ছোট ছেলে- ছেলে বউ ঃ জন ম্যাক্সওয়েল গোমেজ
এডবিনা আলেকজান্দ্রিয়া পেনিওটি

নাতী-নাতনী ঃ রুফাস এঞ্জেলো গোমেজ
এ্যামা জোএ্যান গোমেজ
অরোরা জেরালডিন গোমেজ
এ্যালা জেনিন গোমেজ
এরেণ অ্যান্টনি গোমেজ
এরিণ অরেলিয়া গোমেজ

উইলিয়াম কেরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
William Carey International School

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

(An Exclusive English Medium School)
Govt. Reg. No. 23/English (EIIN: 903421)
(Play Group to O' Level)

Our Facilities:

- ➤ Air Conditioned Classrooms.
- ➤ Secured with CCTV Camera.
- ➤ Use of modern teaching methodology, Computer, Multimedia, Internet etc.
- ➤ Arrangement of indoor and outdoor games.
- ➤ Special Care for slow learners.
- ➤ Extra Curricular Activities.
- ➤ Standby Power Supply.
- ➤ Limited Seats.
- ➤ School Bus Available.

You are welcome to visit the school Campus along with your kids

Admission going on (Play Group to O' Level) Session: July 2021- June 2022

Main Campus:
Bangladesh Baptist Church, 70-D/1, Indira Road, (West Razabazar)
Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Website: www.wcischool.org
Contact Number: +88 02 222246708, 01989283257

Train up a child in the way he should go, and when be is old he will not depart it.- Proverbs 22:6

উইলিয়াম কেরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
William Carey International School

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

(An Exclusive English Medium School)
Govt. Reg. No. 23/English (EIIN: 903421)

Our Facilities

- Air Conditioned Classrooms.
- Secured With CCTV Camera.
- Use of Modern Teaching Methodology,
- Computer, Multimedia, Internet etc.
- Special Care For Slow Learners.
- Extra Curricular Activities.
- Standby Power Supply.
- Limited Seats.
- School Vehicle Available.

You are welcome to visit the school Campus along with your kids

Admission going on 2021-2022 Play-Std-VI

Savar Campus

Savar Campus: YMCA International Building
B-2 Jaleswar, Near Radio Colony Bus Stand, Savar, Dhaka
Cell: 01709-127850, 01709-091205

Train up a child in the way he should go, and when be is old he will not depart it.- Proverbs 22:6

মৃত্যু করে অমৃত দান

প্রয়াত ইমেল্ডা গমেজ
জন্ম: ৯ মার্চ, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত সিঃ মেরীয়ান তেরেজা
জন্ম: ২৭ নভেম্বর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জুন ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

"ভব কোলাহল ছাড়িয়ে
বিরলে এসেছি হে
জুড়াব হিয়া তোমায় দেখি
সুধা রসে মগন হব হে।"
- (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রিয় মা ও দিদি,

চোখের পলকেই যেন পেরিয়ে গেল মা, তোমার বিদায়ের নয়টি বছর এবং দিদির দশটি বছর। ভবকোলাহল ছাড়িয়ে তোমরা এমন এক নিরালায় নিভৃতে স্থান করে নিয়েছ, যেখানে নেই কোন দুঃখ বেদনা, নেই শোক তাপ। যেখানে পরম পিতার শ্রীমুখ দর্শনে জুড়িয়েছ প্রাণ। আমাদের আশীর্বাদ করো আমরা যেন আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে তোমাদের অনুসরণ করতে পারি। তোমাদের বর্তমান প্রজন্ম, যারা নতুন এসেছে, আমাদের সন্তান এমিলি যে নতুন জীবন শুরু করেছে, সবাই যেন আশীর্বাদিত হয় সুখী হয়। তোমাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

তোমাদের স্নেহধন্য

ছেলে/ভাই: ড. লরেন্স গমেজ, ছেলে বৌ/ভাই বৌ, সুজান গমেজ,
এবং
পরিবারবর্গ।

শুভ বিবাহ

বিগত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ গোল্লা ধর্মপল্লীর (বর্তমানে আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা) পাদ্রিকান্দা গ্রামের প্রামানিক বাড়ির ড. লরেন্স গমেজ ও সুজান গমেজের জ্যেষ্ঠা কন্যা **Emily Gomes** আমেরিকাবাসি **Daniel Cavanaugh** এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন যে যেখানে আছেন সকলে নব দম্পতিকে আশীর্বাদ করবেন যেন তাদের দাম্পত্য জীবন হয় সুখের, অটুট থাকে তাদের বিবাহ বন্ধন। সেই সাথে **শুভ বড়দিন ও নববর্ষ** উপলক্ষে দেশ বিদেশে অবস্থানরত সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সবার জীবনে বড়দিন বয়ে আনুক অনাবিল শান্তি ও আনন্দ, নববর্ষ জ্বেলে দিক নতুন আলোর দিপালী।

বাবা: ড. লরেন্স গমেজ
মা: সুজান গমেজ
পাদ্রিকান্দা, প্রামানিক বাড়ি।

২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত এলিজাবেথ শেফালী গমেজ

জন্ম: ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
গোল্লা, ঢাকা

মৃত্যু: ২৬ অক্টোবর, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
নিউ জার্সি, ইউএসএ

"আমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়েছে। খ্রিস্টের পক্ষে আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি, দৌড়ের খেলায় শেষ পর্যন্ত দৌড়েছি এবং খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসকে ধরে রেখেছি।" -২য় তিমথি ৪:৭

পৃথিবীর চির আবর্তনে তুমি এসেছিলে আমাদের একান্ত কাছে, অতি আপনজন হয়ে। তেমনিভাবে ভালোবাসা, মায়া-মমতার সকল বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেছ আমাদের একা করে বহুদূরে। বছরান্তে আবার ফিরে এসেছে সেই বেদনাসিক্ত স্মৃতিময় ২৬ অক্টোবর, যেদিন তুমি চলে গেছ আমাদের ছেড়ে। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গীয় চিরশান্তি দান করুন।

শোকাহত পরিবারবর্গ

স্বামী : রবার্ট গমেজ (আদি)

সন্তানগণ : ফদার ষ্ট্যানলী, জেমস্-সুইটি, জেভিয়ার-তুলি, অলড্রিন-ন্যান্সি, জুয়েল-লতা মাইকেল-মনি ও নোয়েল-চৈতি।

নাতি-নাতনী : এলিজাবেথ মণিকা, রবার্ট যোনাস, খ্রীষ্টফার নিকোলাস, এন্ড্রিয়া সুজানা, যোয়ানা ভিক্টোরিয়া, যোনাথন রিচার্ড, এইডেন খৃষ্টান গমেজ (আদি), এ্যান্তনী এবং ব্যান্ডডন গমেজ

শুভ বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

(স্থাপিত: ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ, রেজি. নং ২৩/৮৪, সংশোধিত: ০১/২১)
নাইট ভিনসেন্ট ভবন, ডাকঘর: নাগরী, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।
ই-মেইল: nagari_cccu@yahoo.com, www.ncccul.net

বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিষদ(কার্যকাল ২০২১-২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ)

ফিলিপ গমেজ
চেয়ারম্যান

নিখিল রোজারিও
ভাইস-চেয়ারম্যান

টুটুল পিটার রড্রিক্স
সেক্রেটারী

বিদ্যুৎ ভিক্টর এসেনসন
ট্রেজারার

ঝুমুর ফেলিসিতা পিউরীফিকেশন
পরিচালক

দীপ স্মীথ রোজারিও
পরিচালক

জিকো ফ্রাঙ্ক রোজারিও
পরিচালক

রিপন নিকোলাস রড্রিকস্
পরিচালক

মিতা জসিন্তা রোজারিও
পরিচালক

সুব্রত রিচার্ড রোজারিও
পরিচালক

অপূর্ব এ্রাসিয়াস গনছালভেস
পরিচালক

রানা দরেছ
পরিচালক

ঋণদান কমিটি

বাবলু নিকোলাস গমেজ
সভাপতি

শাওন পিটার ডি' ক্রুশ
সদস্য

জেকসন পিটার গমেজ
সদস্য

প্লাসিড ক্রুশ
সদস্য

জ্যারী ষ্ট্যানলী কস্তা
সদস্য

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটি

প্রদীপ আগষ্টিন গমেজ
সভাপতি

মার্শেলীনা রোজারিও
সদস্য

মার্ক রড্রিকস্
সদস্য

নাগরী ক্রেডিট পরিবারের পক্ষ থেকে শুভ বড়দিন ও ইংরেজী নববর্ষ-২০২২ এর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

৭ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পারুল ডরোথি গমেজ

স্বামী : প্রয়াত খ্রীষ্টফার গমেজ
জন্ম : ১৬ মার্চ, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
পারুল ভিলা, ৩০/১ পূর্ব রাজাবাজার
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

প্রিয় মা, তুমি আমাদের মাঝে নেই এ কথা যেন বিশ্বাস করতে আজো কষ্ট হয়। তোমার প্রতিটা কাজ, তোমার স্পর্শ আমাদের আজো ঘিরে রেখেছে। আমাদের মা ছিলেন এক জন ধর্মপ্রাণ, স্নেহশীল, কর্তব্যনিষ্ঠা, সাহায্যকারিণী, ঈশ্বর নির্ভরশীলা নারী। মানুষের মনের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে, নিরবে-নিভৃতে থেকে তিনি অন্যকে সাধ্যমত সহযোগীতা করেছেন। তার শুভানুধ্যায়ীরা এখনো আমাদের মাকে স্মরণ করেন।
আমাদের মা মিসেস পারুল ডরোথি গমেজ ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রভুর কোলে আশ্রয় নেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।
মা, দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল ৭টি বছর তোমাকে ছাড়া। সর্বদা মনে হয় আমাদের কাছেই আছো। আমাদের বিশ্বাস, তুমি স্বর্গীয় পিতার আশ্রয়ে পরম শান্তিতে আছো এবং আমাদের আশীর্বাদ করছ।

তোমার আত্মার শান্তি কামনায়,

ছেলে ও ছেলে বৌ : বাবু মার্কুজ গমেজ-মার্সিয়া মিলি গমেজ
মেয়ে ও মেয়ে-জামাই : আলো, জ্যোৎস্না-অজিত, উজ্জলা-তপন
নাতি : অভিষেক ইন্যানুয়েল সি. গমেজ
নাতনী ও নাত-জামাই : ডায়না-মার্টিন, বৃষ্টি-ডেভিড, রাত্রি, স্বপ্ন, সৃষ্টি, বিস্ময়, স্পর্শ
পুতি : কাব্য, অনিক ও আনন্দ

Merry Christmas

Cambridge Assessment International Education

SFX GREENHERALD INTERNATIONAL SCHOOL

www.sfxghis.school

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

Sr. Virginia Asha Gomes, RNDM | Principal & Head of Centre BD600

নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন
সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়

৮১ পথ চলার গৌরবময় বছর

প্রবন্ধ

বড়দিন বড় নয়- যদি না থাকে দেবার-সেবার আনন্দ

ফাদার সুনীল রোজারিও

ত্যাগ, দান, ক্ষমা, ভালোবাসা- এগুলো জাগতিক ধারণার অনেক উর্ধ্বে। আবার এগুলো পালন করতে গিয়ে পুণ্যভূমি, বৃন্দাবন বা গয়া কাশী যাবার প্রয়োজন নেই। বিশাল সম্পত্তির মালিক, বড় মাপের দাতা হওয়ার প্রয়োজন নেই। উপোস থাকার নানা আয়োজন উৎসবের প্রয়োজন নেই। এগুলো শুধু করার জন্য, বা পালন করার জন্য, তা কিন্তু নয়। এগুলো ধারণ করা যায়- আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সামর্থ আছে, সেগুলো অন্যের সাথে সহভাগিতা ক'রে। আমি অন্যের জন্য কিছু করছি, এখন ঈশ্বর আমার প্রতি যা করার তাই করবেন। আমি চাইবো, আমার পরকাল যেনো সুখের হয়। এক বিধবা দান করলো মাত্র এক বা দু'টি পয়সা। এই দান ছিলো তার কষ্ট থেকে, বাড়তি সম্পদ থেকে নয়। ঈশ্বর বিধবার দানই গ্রহণ করলেন, সমাজনেতারটা নয়। অনেক সময় দান বাক্সে লেখা থাকে,'মুক্ত হস্তে দান করুন'। মুক্ত হস্তে দান মানে, সেই দানের যেনো কোনো শর্ত না থাকে। মানে দান করে আমি যেনো কোনো কিছু চেয়ে না বসি। আমাদের চার্চের শিক্ষায় দান মানে শুধু আর্থিক সহযোগিতা নয়, সাথে অবশ্যই থাকবে সহভাগিতা। আমি যখন একজনকে ভালো পরামর্শ দেই, যখন ভালো পথ দেখাই, বিপদে আপদে যখন পাশে গিয়ে দাঁড়াই, আমি যখন মানবাতাবাদী হয়ে উঠি, তখন আমি নিজে হয়ে উঠি অন্যের স্বার্থে দানের বস্তু, দানের সম্পদ, দানবাক্স। অর্থাৎ আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে তখন অন্যের কাছে হয়ে উঠি একটি দান।

বড়দিন উৎসব সামনে রেখে একটু তাকানো যাক বিশ্ব বাস্তবতার দিকে। এখন বিশ্বজুড়ে বাস্তুহারা মানুষের সংখ্যা আট কোটি ৪০ লাখে এসে দাঁড়িয়েছে। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনা মহামারি, দারিদ্র, খাদ্য, নিরাপত্তাহীনতা, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বাস্তুচ্যুত দুর্দশা জটিল করে তুলেছে। বিশ্বে এখন অতি দরিদ্র্যের সংখ্যা ৭০ কোটি ২০ লাখ। আবার ৮০ কোটি ৫০ লাখ মানুষের রয়েছে পরিমান খাদ্যের অভাব- যার মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৩০ কোটি। ইউনিসেফর মতে, বিশ্বে দরিদ্রতার প্রভাবে প্রতিদিন ২২ হাজার শিশু মৃত্যুবরণ করে। করোনা মহামারি থেকে অনেক বেশি। এছাড়া পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মারা যায় প্রতি বছর ৬০ লক্ষ। এছাড়াও ৭০ কোটি ৫০ লাখের মতো মানুষ বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত, ফলে ডাইরিয়াজনিতো রোগে প্রতি বছর আট লাখ ৪২ হাজার লোক মারা যায়। দুঃখের বিষয়, সামান্যতম চিকিৎসার অভাবে বছরে ২০ লাখ শিশু মারা যায়।

বিশ্বের এক প্রান্তে যখন বিলাসী জীবন, খাদ্যের বিশাল অপচয়, অন্য প্রান্তে খাদ্যের জন্য ভূখা মানুষের মিছিল ও হাহাকার। যতো মানুষ মরছে এইডস, ম্যালেরিয়া ও যক্ষায়, তার চেয়ে অনেক বেশি মরছে ক্ষুধা অনাহারে। প্রায় ১০০ কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের এই পৃথিবীতে অপচয় হয় মোট উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় ৩০-৪০ ভাগ। উন্নত বিশ্বে যে পরিমান কাঁচা এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ফেলে দেওয়া হয় তার পরিমান ২০০ কোটি টন। বিশ্বে বছরে প্রায় ৭২০ কোটি ম্যাট্রিক টন খাদ্য উৎপাদিত হয় যা দিয়ে এক হাজার কোটি মানুষ খেয়ে বাঁচতে পারেন। কিন্তু এর মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত খাদ্য ব্যবহার হয় না বা অপচয় হয়। যার মধ্যে রয়েছে- মৌসুমি ফসল, সব্জি, ফসল থেকে তৈরি পশু খাদ্য, টিনজাত এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত খাদ্য। এই খাদ্য হয় অপচয় হয়, না হয় ফেলে দেওয়া হয়। একজন মানুষের বছরে লাগে গড়ে দুই হাজার ২১২ পাউন্ড খাদ্য।

জাতিসংঘের মতে, বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি। এক রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, বিশ্বের ১০০জন শীর্ষ ধনী ব্যক্তি বছরে যে পরিমান সম্পদ আয় করেন, তা দিয়ে বিশ্বের চরম দারিদ্রতা চারবার দূর করা সম্ভব। বিশ্বে আর্থিক মন্দার সুযোগ নিয়ে তারা এই কাজটি করছেন, যা দিয়ে দারিদ্রসীমারও নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ভাগ্য চারবার বদলে ফেলা যেতো। অর্থাৎ বিশ্ব থেকে দারিদ্র বিদায় করতে যে পরিমান অর্থের প্রয়োজন তার চারগুণ রয়েছে মাত্র ১০০জন ধনীর তহবিলে। এর বিপরীতে দরিদ্র মানুষের আয় গড়ে ১০০ টাকার কম।

গত ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ প্রচার করা হয়েছিলো, 'মেক পভার্টি হিস্টোরি', অর্থাৎ দরিদ্রকে ইতিহাসে পাঠিয়ে দাও। বাস্তবে দরিদ্রকে ইতিহাসে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি- শীর্ষ ধনীদের অধিক লোভের কারণে। এই বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত আর্চবিশপ ডেজমন্ড টুটু বলেছেন, "ক্ষুধা নির্মুল করা বা ক্ষুধা চিকিৎসার অযোগ্য কোনো রোগ নয় বা এড়ানো যাবে না এমন কোনো নির্মম বিষয় নয়। কোনো শিশু তার পেটে ক্ষুধা নিয়ে ঘুমাতে যাবে না, এটা নিশ্চিত করা সম্ভব।" সৃষ্টিকর্তা সবার জন্যই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন- কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নয়। ঈশ্বরের দেওয়া বিধানকে মানুষ মোকাবেলা করবে, মানুষের বিধান দিয়ে নয়, ঈশ্বরের বিধান দিয়ে। তবেই সহভাগিতা ও দানের মধ্যদিয়ে ক্ষুধা ও অনাহারমুক্ত সুন্দর পৃথিবী তৈরি হবে। জাতিসংঘ- ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বেঁধে দিয়ে বলেছে যে, ২০৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিশ্ব থেকে ক্ষুধা দূর হবে। কিন্তু সেই লক্ষ্য যে পূরণ হবে না তা নিশ্চিত করে বলা যায়। বরং করোনা মহামারির কারণে লক্ষ্য আরো বহু বছর পিছিয়ে যাবে। জাতিসংঘের প্যারিস সম্মেলন পরিবেশ রক্ষায় ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে চুক্তি করেছিলো- কিন্তু বাস্তবে কোনো কাজই হয়নি। গত নভেম্বর গ্লাসকো সম্মেলনে চার হাজার পৃষ্ঠার প্রতিবেদনের বাস্তবায়ন না হওয়ার অজুহাত তুলে ধরা হয়েছে।

ঈশ্বর কাঙাল নন যে আমার কাছ থেকে এক থালা ভাত বা এক বাটি জল বা দু/একটি ঝুনা নারিকেল চেয়ে নিবেন। তিনি সর্বশক্তিমান এবং তিনিই বিশ্বের সব কিছুর দাতা। তবে এক জায়গায় ঈশ্বর মানুষের কাছে এসে কাঙাল হোন, তিনি আমার কাছে চেয়ে বসেন। তিনি আমার "অন্তর" চেয়ে নেন, আমার অন্তর চাইতে এসে ঈশ্বর আমার কাছে কাঙাল হয়ে থাকেন। আসলেই আমার অন্তর থেকে ঈশ্বর কী চান? মানুষের অন্তর থেকেই আসে ত্যাগ, দান, ক্ষমা ও ভালোবাসার সিদ্ধান্ত। সাধারণ অর্থে, 'অন্যের স্বার্থে আমার থেকে কিছু দিয়ে দেওয়া।' এই দিয়ে দেওয়ার মধ্যদিয়ে আমি অন্যের সান্নিধ্যে আসি। অন্যের সাথে আমার প্রাণ মিশে যায়। একজন রোগীকে এক ব্যাগ রক্ত দেওয়া মানে রোগীর প্রাণের সাথে আমার প্রাণ মিলিত হলো। ত্যাগের গল্পটা এই রকমই। আমার ভাণ্ডার যদি পরিপূর্ণ থাকে তবে সেই ভাণ্ডারে আর কিছু ভরার সুযোগ থাকে না। আমি যদি আমার ভাণ্ডার খালি করি তবেই সেখানে নতুন করে রাখতে পারবো। এই ত্যাগের মধ্যদিয়েই আমার ভাণ্ডারে পরকালের জোগান দিতে পারি। ঈশ্বরকে পেতে হলে আগে মানুষকে পেতে হবে। আমার যতো ভালো কাজ তা মানুষের মধ্যদিয়েই ঈশ্বরের কাছে গিয়ে পৌঁছে। মানুষকে বঞ্চিত করে ঈশ্বরকে সঞ্চিত করা সম্ভব নয়। নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগ, দান, ক্ষমা ও ভালোবাসার মধ্যে আছে এক মহিমা, এক অনাবিল আনন্দ।

আজ ন্যায্যতা কোথায়! ঘরে বাইরে রাষ্ট্রে কোথায় ন্যায্যতা! আমাদের দেশের কথাই যদি বলি তাহলে দেখুন, এই দেশটাকে যারা উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তারা সবাই গরিব মানুষ। ১. গ্রাম বাঙলার কৃষক ২. পোষাক শিল্পের শ্রমিক ৩. প্রবাসী শ্রমিক। এই তিন গরিব শ্রেণির মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার হার কতো। বিএ বা এমএ ডিগ্রি নাই বললেই চলে। কৃষকের কতো বিঘা জমি থাকে? পোষাক শ্রমিকের? বা একজন প্রবাসী শ্রমিকের কতো বিঘা? যে টুকুও বা ছিলো বিক্রি করে দালালদের দিয়ে-কয়ে পাড়ি জমিয়েছেন মরুভূমির দেশে। অথচ ৭৫ হাজার টাকা দিয়ে টিকেট কিনে কনসার্ট দেখতে পারে এমন লোকের অভাব নেই। বাংলাদেশে এমন ধনী ব্যক্তি আছেন যারা একাই বড় একটা সেতু নির্মাণ করতে পারেন। অথচ একজন পোষাক শ্রমিককে মাসে পাঁচ হাজার টাকা দিতে তারা নারাজ। কোথায় ন্যায্যতা? যাদের শ্রমে নির্মিত তারাই হয় বঞ্চিত- এটাই হলো বাস্তবতা।

যদি শান্তির কথাই বলি তাহলে প্রথমেই বলতে হয় কিছু লোক একসঙ্গে বাস করলেই সেখানে শান্তি থাকবে এমন কথা বলা যাবে না। তারা একজন আর একজনকে নাও জানতে পারে। তাদের মধ্যে জানা চেনা থাকলেও ভালোবাসা নাও থাকতে পারে। শান্তি হলো, Who live together, who know one another, who love one another. (শান্তি হলো একসাথে বাস করা, একজন অন্যজনকে জানা এবং একে অন্যকে ভালোবাসা)। অন্য কথায় বলা যায়, একটা ইটের স্তুপকে ঘর বলা যাবে না, কিছু শব্দ জোড়াতালি দিলেই একটা বাক্য গঠন হয় না, কিছু সুর একসাথে গেঁথে দিলেই সংগীত হয় না। তেমনি কিছু লোক একসাথে বসবাস করলেই শান্তি থাকবে তেমন নয়। Peace means, life shared in love. (ভালোবাসার মধ্যদিয়ে জীবনের সহভাগিতা) ভালোবাসার মধ্যদিয়ে যখন সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখনই সেখানে শান্তি বিরাজ করে। শান্তি হলো শর্তহীনভাবে অন্যকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকা। যে যেমন, তাকে সেভাবে গ্রহণ করা এবং সত্তরগুণ সাতবার ক্ষমা করার ক্ষমতা থাকা। Peace means absence of violence, absence of communal attitudes, absence of discrimination, absence of war, absence of crimes, etc. Peace is a CALL of God. We are all ambassador of Peace. সৃষ্টিকর্তা আমাদের প্রত্যেককে প্রেরণ করেছেন একজন শান্তির দূত করে। পোপ ষষ্ঠ পল বলেছিলেন যে, Peace depends on you too. অর্থাৎ তোমার উপরও শান্তি নির্ভর করে। কতোভাবেই না আমি নিজে অন্যের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারি। কতোভাবে আমি নিজেকে প্রশ্ন করতে পারি। কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমরা অশান্তির জন্য অন্যকে প্রশ্ন করে থাকি, দোষ দিয়ে থাকি। নিজে দোষী হতে চাই না। আমি যখন অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে না আসি, নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন না করি- তাহলে অন্যে তার অধিকার ভোগ করবে কীভাবে ? এভাবেও আমার দ্বারা শান্তি বিঘ্নিত হয়।

আমরা শান্তি স্থাপন করতে পারি না কারণ আমরা অন্যকে ক্ষমা করতে শিখিনি। অন্যের সঙ্গে আমার যখন বিবাদ হয় আর তা যদি আমি মিটাতে চাই তাহলে ক্ষমা করা শিখতে হবে। যিশুর শিষ্যেরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, একজন যদি অপরাধ করে আর ক্ষমা চায় তবে তাকে কতোবার ক্ষমা করা যেতে পারে, সাতবার কী? যিশু বললেন কেনো সাতবার, সত্তরগুণ সাতবার। তার মানে একজন যতোবার অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চায় তাকে ততোবার ক্ষমা করতে হবে। আমরা পরের বিচার করতে চাই কিন্তু নিজের বিচার করতে চাই না। যিশু বলেছেন, আমার শান্তি তোমাদের দিয়ে গেলাম। ক্রুশবিদ্ধ যিশু অপরাধীদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সব ধর্ম শান্তির ধারক হলেও মানুষ কিন্তু শান্তি বিনাশ করেই চলেছেন।

মানুষের প্রকৃত সম্মান কিসের থেকে আসে? তার সম্পদ? তার ক্ষমতা? তার পাণ্ডিত্য? ধর্মীয় আলোকে যদি মানুষের বিচার করতে যাই তবে বলতে হবে যে, সেই ব্যক্তিই হলেন সম্মানলাভের যোগ্য যিনি সত্যের উপাসক। সেই ব্যক্তিই হলেন সম্মানীত, যিনি নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে যান অন্যের সঙ্গে সহভাগিতার জন্য- পরামর্শ দিয়ে, সৎ উপদেশ দিয়ে ও বিভিন্নভাবে দান করে; ন্যায্যতার মধ্যদিয়ে অন্যের অধিকার নিশ্চিত ক'রে। এইসব গুণাবলীর যিনি মালিক, তিনিই মাত্র হতে পারেন একজন শান্তির বাহক বা শান্তির দূত। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সেই কেবল সম্মানীত। সত্যিই যদি এই বড়দিন আমার জন্য- তাহলে আসুন এগিয়ে যাই, ত্যাগ, দান, ক্ষমা, ভালোবাসা ও শান্তির পতাকা হাতে নিয়ে। "জয় উর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়। ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে।" পাঠকদের জানাই বড়দিনের শুভেচ্ছা॥

মহান খ্রিস্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে কারিতাস সকলকে জানাচ্ছে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক: কারিতাস বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর একটি আর্থ-সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নমূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। কারিতাস বাংলাদেশ বিগত ৫০ বছর যাবৎ দেশ গঠনে ও মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। কারিতাস বাংলাদেশ এর ছয়টি কৌশলগত লক্ষ্যের আওতায় ১১২টি প্রকল্প ও তিনটি ট্রাস্টের মাধ্যমে নানামুখি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। তন্মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নতুন প্রকল্প নিম্নরূপ:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেক্টরের মাধ্যমে কতিপয় জরুরি সাড়াদান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

এ সেক্টরের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে প্রায় ১৮২,১০২ (জরুরি সাড়াদান -৯৪,৭৬৪, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ৫৯,৩৪৯, ইআরপি-কক্সবাজার- ২৭,৯৪৯) পরিবারের ৭১৩,৮৫০ (নারী ৩৫৬,৬১২) জনের কাছে প্রত্যক্ষ ও সরাসরি মানবিক সহায়তা ও ১,৩৯৩,৯৫৮ মানুষের কাছে পরোক্ষভাবে কোভিড-১৯ সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছাতে পেরেছে।

দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেক্টর মোট ছয়টি প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগে মোট ৩৭টি জরুরি সাড়াদান ও পুনর্বাসন প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ৪১৫,৭১৫,০৩৫ তহবিল সংগ্রহে ভূমিকা রাখে। মোট ১৮টি দাতা সংস্থার নিকট থেকে এসব তহবিল অনুদান হিসেবে সংগৃহীত হয়। সর্বমোট সংগৃহীত তহবিলের মধ্যে কোভিড-১৯ প্রকল্প ২৯৬,৫৫৬,৩১৮; বন্যা ৭৮,১৬৬,২৬৬; ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও ইয়াস ৭৩,৪৬৩,৩৯২ ও চট্টগ্রাম বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের জন্য ৫,৭২২,৪৭৫ তহবিল সংগৃহীত হয়।

এ তহবিল দিয়ে আটটি অঞ্চলের ৬টি সিটি কর্পোরেশনসহ ৪৪টি জেলার ১৪৩ উপজেলার ৪৯০ ইউনিয়নের ৯৪,৭৬৪ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ, হাইজিন উপকরণ, খাদ্য, গৃহ নির্মাণের উপকরণ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ২৪১,১১০ (কোভিড ২২৬,৪০৩, বন্যা ১২,৯৫৩, ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ১,৩১৬ ও চট্টগ্রাম বস্তিতে অগ্নিকাণ্ড ৪৩৮) পরিবারের মাঝে এবং কোভিড ও অন্যান্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে বিলবোর্ড স্থাপন, লিফলেট, পোস্টার, মাস্ক, হাত ধোয়ার পয়েন্ট স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে।

- **কোভিড-১৯:** জরুরি সাড়াদানের নতুন ২৩টি ও চলমান প্রকল্প ৯টির মোট বাজেট ২৯৬,৫৫৬,৩১৮ (নতুন প্রকল্প ২৬৩,৬০৫,৫৮৭ চলমান প্রকল্প ৩২,৯৫০,৭৩১) টাকা দিয়ে মোট ৫৯,৮৪৭ (নতুন প্রকল্প ৪৯,০৬৮ ও চলমান প্রকল্প ৭,৭৭৭) পরিবারকে সহায়তা;
- **বন্যা ২০২০-২০২১:** জরুরি সাড়াদান ও পুনর্বাসন ১০টি প্রকল্পের মোট বাজেট ৭৮,১৬৬,২৬৬ টাকা দিয়ে মোট ১৪,০৬৩ পরিবারকে নগদ অর্থ, খাবার, জীবিকা, হাইজিন উপকরণ, অবকাঠামো ও ঘর মেরামত প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- **চট্টগ্রাম শহরের তিনটি বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে জরুরি সাড়াদান প্রকল্প:** ইউকেএইড-স্টার্ট এর অর্থায়নে ৫,৭২২,৪৭৫ টাকা দিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তিনটি বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে মোট ৪৩৮ পরিবারের মাঝে শর্তহীন নগদ অর্থ ও হাইজিন উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে বছরের জরুরি মানবিক সাড়াদান কার্যক্রম শুরু হয়।
- **ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ২০২০ এবং ইয়াস ২০২১ এ ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সাড়াদান ও পুনর্বাসন প্রকল্প:** তিনটি জরুরি সাড়াদান ও একটি পুনর্বাসন প্রকল্পের মোট ৭৩,৪৬৩,৩৯২ টাকা তহবিল সংগৃহীত হয়। বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত ২০,৬৮৯ পরিবারের জন্য নগদ অর্থ, খাদ্য, গৃহ নির্মাণ ও হাইজিন উপকরণ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।
- এছাড়াও অন্য ৫টি সেক্টরের ৩০ চলমান ও নতুন একটি প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর জন্য অভাবগ্রস্তদের সহায়তা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য দাতা সংস্থা ও দেশের বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফোরাম ও ক্লাস্টার এর কাছে নিয়মিত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এ সেক্টর।

বল প্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য জরুরি সাড়াদান কর্মসূচি কার্যক্রম-

এ কর্মসূচির আওতায় মোট নয়টি ক্যাম্পে (ক্যাম্প-৪, ৪ বর্ধিত, ক্যাম্প-৫, ক্যাম্প-২০ বর্ধিত, ক্যাম্প ১৩, ক্যাম্প ১৭, ক্যাম্প ১৯, ক্যাম্প ১ ডব্লিই, ক্যাম্প ১ ই) কারিতাস কাজ করছে। এ কর্মসূচির জন্য ৩০টি দাতা সংস্থার মোট ১,০৬০,৯৮১,০৩৫ টাকা তহবিল নিয়ে

মোট ৫৭,৭০৮ জনবল প্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য শেল্টার, ওয়াশ, সুরক্ষা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাসকরণ (ডিআরআর) কার্যক্রম

- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কার্যক্রমের অধীনে বর্তমানে ১৪টি প্রকল্প রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি ডিআরআর প্রকল্পসমূহের জন্য কারিতাস পরিবারের নিয়মিত বন্ধু ৩টি দাতা সংস্থা (কারিতাস জার্মানি, সিকোর্স ক্যাথলিক-কারিতাস ফ্রান্স, সিআরএস) ও ইনস্টিটিউশনাল দাতা সংস্থা ইউএসএআইডি এর সাথে এ

সেক্টরের নিয়মিত যোগাযোগ ও ভাল সম্পর্ক অব্যাহত থাকায় তহবিল প্রাপ্তি, কোভিড-১৯ এর কারণে প্রকল্পের মেয়াদ কমানো বা বাজেট কমানো ইত্যাদি সংক্রান্ত কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। ডিআরআর এর মাধ্যমে ৫৯,৩৪৯ পরিবার নিয়মিত ও দীর্ঘমেয়াদি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ কার্যক্রমের আওতায় সরাসরি সেবা পাচ্ছে।

আরও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- চট্টগ্রাম অঞ্চলে ২২-২৪ নভেম্বর তিন দিন ব্যাপী "৩০তম বার্ষিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মূল্যায়ন, শিখণ ও পরিকল্পনা কর্মশালা-২০২১" সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালার উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাননীয় মহাপরিচালক জনাব আতিকুল হক, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, কারিতাস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী এবং কারিতাস এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও কারিতাস বাংলাদেশের প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক ডঃ বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও উপস্থিত ছিলেন। এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেক্টরের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত/কর্মরত কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা; কারিতাসের বিভিন্ন সেক্শন/সেক্টরের ব্যবস্থাপক/উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক/সেক্টর প্রধান; আঞ্চলিক/প্রকল্প পরিচালক ও কেন্দ্রীয় পরিচালক পর্যায়ের মোট ৬৬ জন অংশগ্রহণ করেন।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন বিশেষ করে উপকারভোগী বাছাই, মনিটরিং ও প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আরও সহজ, মানসম্পন্ন, দ্রুত ও নির্ভূলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে জরুরি সাড়াদান প্রকল্পগুলোতে কম সময়ের মধ্যে দ্রুততার সাথে অনেক মানুষের কাছে সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যাপক ও কার্যকর ব্যবহার হচ্ছে এ সেক্টরের মাধ্যমে।
- দুইটি মোবাইল মানি ট্রান্সফার সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (বিকাশ ও নগদ) এর সাথে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি হওয়াতে উপকারভোগীদের কাছে দ্রুত ও ঝুঁকি ছাড়া নগদ অর্থ বিতরণে নিয়মিত ২% সার্ভিস চার্জ এর পরিবর্তে মাত্র ১% দিয়ে টাকা ট্রান্সফার করা সম্ভব হয়েছে। এতে একই সাথে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দাতা সংস্থার আস্থা অর্জনের পথ সুগম হয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেক্টরের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে আঞ্চলিক এমনকি মাঠ পর্যায় পর্যন্ত ভাল সমন্বয় ও দলগত মনোভাব নিয়ে কাজ করার প্রবণতা তৈরি হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

কোভিড -১৯ মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসীদের জীবিকার সুযোগ

বাংলাদেশ কোভিড-১৯ মহামারির অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ এবং এর নিম্নমধ্যম আয়ের

অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। কোভিড-১৯ বস্তিবাসীদের জীবিকার সুযোগকে সীমিত করেছে। সারা দেশে লকডাউন থাকার কারণে তাদের আয় কমে গেছে। আসল প্রেক্ষাপট হল এই মহামারি পরিস্থিতিতে সবাই অভাবগ্রস্ত কারণ বেশিরভাগ মানুষ তাদের চাকরি বা উপার্জনের উৎস হারিয়েছে যা একটি সংকট তৈরি করেছে। এই সকল ঝুঁকি প্রশমনে ও সংকট নিরসনে জিআইজেড ও কারিতাস বাংলাদেশ সমন্বিতভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে তন্মধ্যে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২টি চলমান আছে। বাস্তবায়িত ৩টি প্রকল্প যথাক্রমে-

- কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে ঝুঁকিপূর্ণ বস্তি সম্প্রদায়গুলিকে সহায়তাকরণ প্রকল্প যার প্রধান উদ্দেশ্য হল টেকসই জীবিকার জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদান এবং সচেতনতামূলক তথ্যের মাধ্যমে খুলনা এবং সাতক্ষীরার কোভিড-১৯ এর ঝুঁকিপূর্ণ বাসিন্দাদের সক্ষমতা টেকসইকরণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের কারণে শহুরে ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ইউএমএমসিসি)-II যার মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে একাধিক বিপদগ্রস্ত মানুষ এবং কোভিড-১৯ এ মানবিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারকরণ এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের কারণে শহরে ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ইউএমএমসিসি) যেখানে ৪টি কিস্তির মাধ্যমে মোট ২০,০০০ টাকা করে প্রদান করা সম্পন্ন হয়েছে ।

উল্লিখিত ৩টি প্রকল্পের আওতায় প্রত্যক্ষভাবে মোট ২১,০৫৪ জন ঝুঁকিপূর্ণ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় এক লাখের বেশী মানুষ সহায়তা লাভ করেন যেখানে মানুষ সচেতনতামূলক, আর্থিক, কাজের বিনিময়ে অর্থ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা লাভ করেন। এই সকল প্রকল্প কোভিড-১৯ সহ পরবর্তী অন্যান্য ঝুঁকি হ্রাসে সহায়ক হবে। এই মহামারি পরিস্থিতিতে বস্তিবাসীদের সাথে কাজ করা কঠিন ছিল কিন্তু কারিতাস খুলনা অঞ্চলের দক্ষ ব্যবস্থাপনা, জিআইজেড এর সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং মাঠ পর্যায়ের পর্যাপ্ত সহায়তার ফলে বিপুল সংখ্যক উপকারভোগির সাথে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সহজ হয়েছে। ইতিমধ্যে মানুষ আইজিএ এবং স্ব-কর্মসংস্থান কার্যক্রম শুরু করেছে এবং আশা করা যেতে পারে যে এই প্রকল্পটি মহামারি আক্রান্ত সম্প্রদায়ের জীবন-যাপনের পরিবর্তন করতে পারে।

বর্তমানে বস্তিবাসী তথা ঝুঁকিপূর্ণ জনগণ যেন সকল সুযোগ সুবিধা সহজে পেতে পারে ও ধারণা লাভ করতে পারে সেই লক্ষ্যে জিআইজেড এর অর্থায়নে কারিতাস কমিউনিটি সোস্যাল ল্যাব ও মোবাইল আউটরিচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

কারিতাস ও জিআইজেড এর বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে এই পথচলা দারিদ্র্য বিমোচন, বিশেষভাবে বিভিন্ন ধরনের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা সম্প্রসারণ, কারিগরি

প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃস্বাস্থ্যসেবা, জীবনুখী প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, নেশাগ্রস্থদের চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসন, নেশাগ্রস্থ ও যৌন কর্মীর উন্নয়ন, মা ও শিশুর পুষ্টির উন্নয়ন, ইত্যাদি কাজে অবদান রাখতে পারবে। একই সাথে দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের ধারায় অবদান রাখতে পারবে যা টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এক ধাপ এগিয়ে যেতে সহায়ক হবে।

আলোকিত শিশু প্রকল্পের মাধ্যমে পথশিশুদের জন্য সহায়তা

২০১০ খ্রিস্টাব্দে পথশিশুদের ক্ষতি ও ঝুঁকি কমানোর উদ্দেশে বারাকা সর্বপ্রথম ছেলে পথশিশুদের জন্য কারিতাস জার্মানির আর্থিক সহযোগিতায় "বারাকা ছেলে পথশিশু দিবা আশ্রয় কেন্দ্র" স্থাপন করে। পরবর্তীতে, কারিতাস জার্মানির আর্থিক সহায়তায় পথ শিশুদের জীবন উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়নে "লাইফ" (সঠিক গঠন ও শিক্ষার মাধ্যমে পথশিশুদের জীবিকা উন্নয়ন) নামে একটি প্রকল্পের কার্যক্রম রাজশাহী শহরাঞ্চলে বাস্তবায়ন শুরু হয়। পথশিশুদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সংকল্পে, পর্যায়ক্রমে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে "ড্রীম" (ঢাকা ও ময়মনসিংহ) ও ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে "ঠিকানা" (ঢাকা) নামক দুটি প্রকল্প মেয়ে পথশিশুদের নিরাপদ আবাস প্রদানের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস জার্মানির আর্থিক সহায়তায় উল্লেখিত চারটি প্রকল্পের সমন্বয়ে "আলোকিত শিশু" প্রকল্পটির সূচনা হয়, যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে অধিকতর অভিগম্যতায় উন্নত ও ভালো সমন্বিত যত্ন ও সুরক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে পথশিশু অথবা ঝুঁকিগ্রস্থ শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা এবং তাদের প্রতি অব্যাহত শোষণ, অপব্যবহার, অবহেলা, সহিংসতা এবং বৈষম্য হার হ্রাস করা। বর্তমানে মোট ২,৭০৭ (ছেলে- ১,৩৩৩ ও মেয়ে- ১,৩৭৪) নিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতাভূক্ত কর্মএলাকা: আলোকিত শিশু প্রকল্পটি বর্তমানে বাংলাদেশের তিনটি বিভাগে কাজ করছে: ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী। ঢাকা জেলা মোহাম্মদপুর, গাবতলী, আরামবাগ, বাবুবাজারসহ মোট ১৫টি ওয়ার্ডে (বারাকাসহ), ময়মনসিংহ জেলা সদরসহ ৬টি ওয়ার্ডে আর রাজশাহী জেলায় ৬টি ওয়ার্ডের ১৫টি বস্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের মূল্য লক্ষ্য: অধিকতর অভিগম্যতায় উন্নত ও ভালো সমন্বিত যত্ন ও সুরক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে পথশিশু অথবা ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুরক্ষায় উন্নত করা - যা তাদের শোষণ, অপব্যবহার, অবহেলা, সহিংসতা এবং বৈষম্য থেকে রক্ষা করবে।

আলোকিত শিশু প্রকল্পের মাধ্যমে পথশিশুদের মানসম্মত জীবন পরিচালনার লক্ষ্যে যেসকল সেবা ও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে তা নিম্নরূপ:

- ঢাকাতে মোহাম্মদপুর, গাবতলী, আরামবাগ, বাবুবাজার এবং ময়মনসিংহ শহরে পথশিশুদের জন্য মোট সাতটি ড্রপ-ইন-সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার মধ্যে আরামবাগ এবং বাবুবাজারে মোট দুটি ড্রপ-ইন-সেন্টার শুধুমাত্র মেয়ে পথশিশুদের জন্য। এই কেন্দ্রগুলোতে পথশিশুরা সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত অবস্থানের সুযোগ পায়। তারা এখানে হাতমুখ ধুয়ে, গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে শিখে। খেলাধূলার পাশাপাশি লেখাপড়া, জীবনভিত্তিক শিক্ষাও পায়। দুপুরের খাবার খাওয়া, বিশ্রাম নেয়া, ঘুমানো এবং বিনোদনেরও সুযোগ পায়।
- আরামবাগ এবং বাবুবাজারে মেয়েদের জন্য রাত্রিকালীন যত্ন কেন্দ্র রয়েছে যেখানে ৪০-৫০ জন অসহায় রাস্তায় থাকা মেয়েরা খাওয়াসহ নিরপদে রাত্রিযাপন করতে পারে। এছাড়াও বাবুবাজারে ছেলে শিশুদের জন্যেও একটি নাইট শেল্টার রয়েছে। মোহাম্মদপুর ডিআইসিতে স্থানীয় অনুদানে ১০ জন শিশুকে রাত্রিকালীন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- পথে যে সকল শিশু থাকে তারা খুবই বিপদাপন্ন ও অসহায় অবস্থায় থাকে। অনেকেই তাদের এই অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে পথশিশুদেরকে অপব্যবহার করে ও ঝুঁকিপূর্ণ অনৈতিক জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে এই ধরনের বহুমুখী ঝুঁকি ও ক্ষতির বিষয়গুলো তাদের অবগত করানো এবং নিজেদেরকে নিরাপদে রাখার বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়।
- অসহায় পথশিশুরা যাতে বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে জানতে পারে, ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রকল্প থেকে নেয়া ভাল শিক্ষা, ভালো অভ্যাস এবং উন্নত মানবিক জীবন গঠনের চর্চাগুলো শিশুরা যাতে অন্যের মাঝেও ছড়িয়ে দিতে পারে এবং চলমান রাখতে পারে তার অনুশীলন করা হয়। পথশিশুদের প্রতি নির্যাতন ও হয়রানি হ্রাস, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।
- পথশিশুদেরকে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে (যাদের বয়স ১৬ বছরের উপরে) বিভিন্ন আয়মূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।
- পথশিশুদেরকে তাদের পরিবার ও সমাজে একীভূতকরণের মাধ্যমে যত্ন ও ভালবাসাপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।
- প্রতিটি কর্মএলাকায় প্রতিবন্ধীসহ পথ শিশুদেরকে চিকিৎসা সহায়তা ও শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হচ্ছে।
- প্রকল্পের অধীন পথশিশুদের সুরক্ষা ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য স্থানীয় কমিউনিটিতে/বস্তিতে ২২টি শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে

কমিটিগুলো পথশিশুদের সুরক্ষা ও সার্বিক উন্নয়নকল্পে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

- স্থানীয় কমিউনিটিতে/বস্তিতে পথশিশুদের জন্য ১০২টি শিশু ক্লাব বা দল গঠন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে পথশিশুদের অধিকার ও সুরক্ষাসহ সচেতনতামূলক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

সুস্থ সুন্দর জীবন প্রত্যাশী সকল শিশু। করুণার দৃষ্টি নয় কিন্তু, সুন্দর জীবন পরিচালনায় সহযোগিতাই কাম্য পথশিশুদের। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎকে সুদৃঢ় করে তুলতে শিশুদের সুন্দর ও সমৃদ্ধভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা প্রদান আমাদের প্রত্যেকটি নাগরিকের দায়িত্ব। কারিতাস বাংলাদেশ সেই প্রত্যয় নিয়ে পথশিশুদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

মট্স এ চলমান কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্পসমূহ

মট্স কারিতাস বাংলাদেশের একটি ট্রাস্ট। কারিতাস সুইজারল্যান্ড এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে কারিগরি প্রশিক্ষণ শুরু করে। মট্স বর্তমানে তিন বছর মেয়াদী লং টার্ম মেকানিক্যাল কোর্সের পাশাপাশি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৫টি ট্রেডে (অটোমোবাইল, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল) ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও ওয়েল্ডিং, সিভিল কন্ট্রাকশন, প্লাম্বিং, ইলেকট্রিক্যাল, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং, পেইন্টিং, অটোমোবাইল ও মেকানিক্যাল এর উপর ১ হতে ১৪ সপ্তাহ মেয়াদী ৮০টি শর্ট কোর্স চলমান রয়েছে। মট্স এর নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এর পাশাপাশি সরকারী ও বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থার সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নিম্নে বর্তমানে মট্সের চলমান প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো:

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কন্সট্রাকশন ইন্ড্রাস্ট্রিজ (BACI-SEIP): বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কন্সট্রাকশন ইন্ড্রাস্ট্রিজ এর আওতায় সেইপ প্রকল্প ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি হতে মট্স দক্ষতা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের যৌথ অর্থায়নে কন্সট্রাকশন সেক্টরের ট্রেডসমূহে দক্ষ জনবল তেরী এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। মূলত অল্পশিক্ষিত, মহিলা, দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর যুবসমাজকে বিনা খরচে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ পর্যন্ত মট্স এর মাধ্যমে কন্সট্রাকশন এর ৫টি (ইলেকট্রিক্যাল ইন্স্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স, প্লাম্বিং, এলুমিনিয়াম ফেব্রিকেশন, মেশিনারী, ষ্টীলবাইন্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন) ট্রেডে ৬,৫৪৫ জন যুবক-যুবতী বিনাখরচে ৩ মাস মেয়াদী এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে বিভিন্ন স্থানে কর্মরত আছেন। এই প্রকল্প নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলমান থাকবে। এই প্রকল্পের কাজ মট্স ক্যাম্পাসসহ কারিতাস বরিশাল, খুলনা, সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার'স এসোসিয়েশন (BEIOA-SEIP): বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার'স এসোসিয়েশন এর আওতায় সেইপ প্রজেক্ট ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের জুন হতে মটসে ৪ মাস মেয়াদী দক্ষতা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত করছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং বাংলাদেশ অর্থ মন্ত্রণালয়ের যৌথ অর্থায়নে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের ট্রেডসমূহে দক্ষ জনবল তৈরী এর মূল উদ্দেশ্য। মূলত অল্পশিক্ষিত, মহিলা, দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর যুবসমাজকে বিনা খরচে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের ৪টি (ইলেকট্রিক্যাল ইন্স্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং, ওয়েল্ডিং, মেশিনশপ প্র্যাকটিস) ট্রেডে ১,৩২৩ জন যুবক-যুবতী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে বিভিন্ন স্থানে কর্মরত আছেন।

পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF-SEIP): পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন আওতায় সেইপ প্রজেক্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর হতে মট্স এ তিন মাস মেয়াদী দক্ষতা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে। মূলত অল্পশিক্ষিত, মহিলা, দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর যুবসমাজকে বিনা খরচে হোস্টেলে থাকা খাওয়াসহ ৩টি (রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার কন্ডিশনিং, ওয়েল্ডিং ও লেদ মেশিন অপারেশন) ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং বাংলাদেশ অর্থ মন্ত্রনালয়ের যৌথ অর্থায়নে বিভিন্ন সেক্টরে দক্ষ জনবল তৈরী এর মূল উদ্দেশ্য। এ পর্যন্ত ৩টি ট্রেডে এ প্রকল্পের আওতায় ১৬৮জন কোর্স সম্পন্ন করেছেন। নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রকল্প চলমান থাকবে।

এ বছরটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ জাতীয়ভাবে আমরা উদ্‌যাপন করছি বাংলাদেশের স্বাধীনতার গৌরবময় সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। মাণ্ডলীকভাবেও বছরটি বিশেষ গুরুত্ববাহী কারণ বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মেলনীও-এর সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। অন্যদিকে বিশ্বের সকল কারিতাস সংস্থাসমূহের মৈত্রী সংঘ রোমের ভাতিকানস্থ কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিস উদ্‌যাপন করছে এর ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আর কারিতাস বাংলাদেশ উদ্‌যাপন করছে এর সুবর্ণজয়ন্তী। সুবর্ণজয়ন্তীর মূলসুর - কারিতাস বাংলাদেশ: ভালোবাসা ও সেবায় ৫০ বছরের পথ চলা।

কারিতাস বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল মূলত: ১৯৭০ এর প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা দানের মধ্যদিয়ে। অতঃপর সংস্থাটি জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারী নিবন্ধন লাভ করে। দুর্যোগের মধ্যদিয়ে জন্ম হলেও পরবর্তীতে কারিতাস সামাজিক উন্নয়নে এর কর্মক্ষেত্র বিস্তার করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সেবাকাজ পরিচালনা করে।

কারিতাসের জন্য এ এক অনন্য মুহূর্ত, অভূতপূর্ব অনুভূতি, বিশ্ব স্রষ্টার মহিমা প্রকাশের মাহেন্দ্রক্ষণ। এ জুবিলী উৎসব সত্যিই মহান স্মৃতির উৎসব। অতীতের অর্জন ও সুখময় স্মৃতির কথা স্মরণ করে দীন-দরিদ্র ও পতিত মানুষের প্রতি কারিতাসের ভালবাসা ও সেবা কাজের প্রেরণাদায়ী শক্তির নবায়ন; সকলকে সাথে নিয়ে সকলের সহযোগিতায় আগামী দিনের যাত্রায় এগিয়ে চলা॥

খোলা জানালা

ধরিত্রীর প্রতি অনুরাগ ও ধরিত্রী সংরক্ষণ

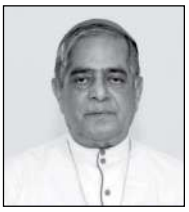

বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি

ধরিত্রী, মানবের আর কত শত প্রাণ-প্রাণী, বৃক্ষ-উদ্ভিদরাজি ও বস্তুর আবাসভূমি, যা সকল ধরিত্রীর ভূমি, জলরাশি ও বিস্তারিত বায়ুমণ্ডলের মাঝে বিরাজিত। সৃষ্টিকর্তার সৃজন ও সৃজন সংরক্ষণের মধ্যদিয়ে কত শত যুগ ধরে সর্ব সৃষ্টির সমন্বয়ে ধরিত্রীর বুকে রচিত হয়ে আছে সকল বস্তু, প্রাণ ও প্রাণীর জীবনযাপনের কাম্য উপযোগী সুন্দর সাবলীল পরিবেশ, সবার সমাদৃত আবাসগৃহ হয়ে।

অথচ ধরিত্রী তথা পৃথিবী গ্রহের এত শত শতক-সহস্রাব্দির ইতিহাসে আমাদের বর্তমান যুগে এসে ক্রমান্বয়ে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতরভাবে আলোচিত হয়ে আসছে সেই সাবলীল জলবায়ু ও পরিবেশের মাঝে দুর্যোগ, বিপর্যয় ও ধ্বংসের ভীতিময় অশুভ কথা। সেইরূপ বিপর্যয়ের বাস্তবতা ঘটেও চলছে স্বল্প থেকে ক্রমান্বয়ে ব্যাপক ও অধিক পরিমাণে অশুভ হওয়ার পথে।

অ. ধরিত্রীর পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারণ:

পৃথিবীর এত কালের ইতিহাসে বিগত দুইশত বছর ধরে চলে এসেছে প্রচুর কয়লা, খনিজ তেল ও গ্যাসের ব্যবহারে মানুষের প্রযুক্তির কলকারখানায় ব্যাপক কর্মকাণ্ড প্রয়োজনীয় সামগ্রী আরও নিত্য-নতুন বাজার-ভোগপণ্য সামগ্রীর উৎপাদন। বর্তমান সময়ে অর্থায়নে উন্নত দেশসমূহের মূল উন্নয়ন কয়লা, খনিজ তেল ও গ্যাস ব্যবহৃত কলকারখানার কর্মকাণ্ড এবং বাজার-ভোগপণ্য উৎপাদনের কর্মকাণ্ডের উপর সার্বিকভাবে নির্ভরশীল হওয়া। এই প্রক্রিয়ার উন্নয়নের মধ্যে ২টি বিষয় লক্ষণীয়: প্রথমত প্রক্রিয়াগতভাবে কয়লা-তেল-গ্যাস ব্যবহারে কলকারখানার একতরফা কার্যকলাপ; দ্বিতীয়ত ফলাফল হিসেবে বাজার-ভোগপণ্য ভিত্তিক একতরফা জাগতিক উন্নয়ন। এই ২টি থেকে ২ ধাপে পরিবেশ বিপর্যয় আসছে: ১টি আসছে পৃথিবীর বাহ্যিক দিক থেকে অর্থাৎ পৃথিবীর ভূমি-জল-বায়ুর দিক থেকে পরিবেশ বিপর্যয়; আর ২টি থেকে আসছে পৃথিবীর অন্তরের দিক থেকে অর্থাৎ পৃথিবীর প্রাণ-প্রাণীর, সর্বোপরি মানবকূলের কৃষ্টি ও সভ্যতার দিক থেকে পরিবেশ বিপর্যয়। পৃথিবীর মানুষ দেশ ও রাষ্ট্র পর্যায়ে ভূমি-জল-বায়ুর বিপর্যয় নিয়ে সবিশেষ আলোচনা করছে; আর মানুষ তার সমাজ ও ধর্ম পর্যায়ে তার মানবীয় ও আত্মিক জীবন তথা তার সত্য কৃষ্টি ও সভ্যতার দিক থেকে পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে সবিশেষ চিন্তিত।

১. পৃথিবীর ভূমি-জল-বায়ুর দিক থেকে পরিবেশ বিপর্যয়: অযাচিত উষ্ণায়ন ও দূষণ

ক. আমরা সবিশেষ লক্ষ্য করি যে, ১৯-২০শ শতাব্দীতে কিছুটা হয়তবা ২০শ শতাব্দীর ২টি মহাযুদ্ধের বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ এবং কিছু অর্থনৈতিক সংকটের ফলে সৃষ্ট "প্রচণ্ড অভাব" থেকে উঠে আসার প্রচেষ্টায় বাজার-ভোগপণ্য উৎপাদনে একতরফা মনোযোগ এসেছে; এবং অতিমাত্রায় কয়লা-খনিজ তেল-গ্যাস ব্যবহারভিত্তিক কলকারখানার এবং গাড়ী-বিমানের কর্মকাণ্ডে চলমান হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে এদের থেকে নিঃসৃত উষ্ণ দূষিত ধোয়া বায়ুমণ্ডলে একটি স্তর সৃষ্টি করার ফলে পৃথিবী থেকে সূর্যতাপ বিকিরণ পথে বাধা পাওয়ায় ভূপৃষ্ঠে ক্রমান্বয়ে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে; ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ অত্যধিক গলে সমুদ্রের জলের উচ্চতা বিপদজনকভাবে বাড়াচ্ছে, আবার উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে উদ্ভিদ-ফসল-গাছপালার বৃদ্ধি ও ফুল-ফলায়নে কুপ্রভাব ফেলছে, কীট-পতঙ্গের অযাচিত বৃদ্ধি আনছে।

অযাচিত উষ্ণায়ন নিয়েই সবচেয়ে বড় ভাবনা। বিগত ৫০ বছর ধরে জাতিসংঘের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রসকল বছরের পর বছর আলোচনায় বসে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হিমশিম খেয়েছে, কেননা তাতে কয়লা-খনিজ তেল-গ্যাসের এত ব্যবহার কমাতে গিয়ে সবার জন্য কলকারখানাভিত্তিক অর্থ-উন্নয়ন যে কমাতে হবে, যার বিকল্প প্রক্রিয়া খুঁজে পাচ্ছে না। শেষে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস-আলোচনায় এই উষ্ণায়ন-বৃদ্ধিকে ২শ বছরের আগের চেয়ে ১.৫ ডিগ্রী পর্যন্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যা বাস্তবায়ন করা মোটেই সম্ভব হচ্ছে না।

বস্তুত উষ্ণায়ন বিষয়টি পৃথিবী গ্রহের "জীবন-প্রাণ" ব্যাপার। আমরা দেখি যে, সৌর জগতের গ্রহগুলির মধ্যে একমাত্র পৃথিবী গ্রহে এমন ভূমি-জল-বায়ু এবং উদ্ভিদ-প্রাণ-প্রাণীর বিস্ময়কর বিকাশ হয়েছে, যার কারণ যে সৃষ্টিকর্তারই পরিকল্পনাতেই, পৃথিবী গ্রহটি সূর্য তাপের উষ্ণতার ও শীতলতার মধ্যম অর্থাৎ মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত হওয়ায় উষ্ণতার ও শীতলতার সহনীয় পরিবেশে এমন বিচিত্র জীবন প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। তাই সূর্য সৌর জগতের কেন্দ্র হলেও পৃথিবীতে আশ্চর্যময় প্রাণ-জীবন-প্রকাশের দিক থেকে পৃথিবী সৌর জগতের, হয়তবা সমগ্র বিশ্বেরই "কেন্দ্রস্থান" হয়ে অবস্থান করছে। পৃথিবীতেও উষ্ণতা ও শীতলতার সমতার হিসেবে সর্বত্র ব্যাপক আবার মরু ও মেরু অঞ্চলে সীমিত প্রকাশ দেখতে পাই। তাই পৃথিবী গ্রহে উষ্ণতা ও শীতলতা নিয়ে কোন অবহেলা চলে না।

খ. দ্বিতীয়ত, কয়লা, খনিজ তেল ও গ্যাসের ব্যবহারে এককভাবে এত কলকারখানার অপরিকল্পিত ক্রিয়াকলাপের ফলে এসেছে অভাবনীয় দূষণ, যা ২টি পর্যায়ে ঘটছে:

প্রথমত দূষণ হচ্ছে বাহ্যিক বায়ুমণ্ডল-ভূমি-জলে; দ্বিতীয়ত দূষণ জগতে মানবীয় জীবন ও কৃষ্টির উপরে ।

ধরিত্রীর বাহ্যিক দূষণ: অত্যধিক দূষিত বর্জের কারণে বায়ুমণ্ডলে এবং ভূমি ও জলে এসেছে লাগামহীন নোংরা দূষণ, যা নদী-নালা, শস্যখেত, রাস্তাঘাট ইত্যাদি স্থানে কেমন বিশ্রী অবস্থায় পড়ে থাকছে।

তবে পৃথিবীতে প্রতিদিন সবকিছুতেই নির্ধারিতভাবে দূষণ হওয়া ও তা আবার নির্ধারিতভাবেই শোধিত হয়ে পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রতিদিনের স্বাভাবিক কথা। তবে কলকারখানা ইত্যাদির দূষণ সৃষ্টির ও শোধনের কোন পরিকল্পনা এমনকি চিন্তা-চেতনাও নেই বলে কলকারখানার "বর্জ" শেষে নোংরা "আবর্জনা" হয়ে জমে থাকছে। এই দূষণ সৃষ্টি করার ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা, যথাযথ প্রজ্ঞা ও শুভ চেতনার ব্যাপক অভাব। আবার অনেক খাদ্যদ্রব্যও দূষিত করে সৃষ্টি করা বা প্রস্তুত করা কেমন স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। এ সব তাই খুবই দোষণীয়। কেন এই বিশ্রী দূষণ নিয়ে এত প্রাণহীন অচেতনতা?

ধরিত্রীর অন্তরগত দূষণ: পৃথিবীতে প্রতিদিনের খাদ্যের ও অতি প্রয়োজনীয় বস্ত্র-গৃহ ইত্যাদির অভাব ও প্রাপ্তি নিয়ে অনেক কথা। সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর মানুষের প্রতিদিনের খাদ্য ও পানীয় এবং জীবনের প্রয়োজন ও যথার্থ আরামের জন্য বহু দ্রব্যসামগ্রী দিয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে একদিকে পৃথিবীতে রয়েছে দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবভিত্তিক নিষ্পেষণমূলক দারিদ্রের দূষণ, যার সংশোধন আমাদের অতি জরুরী কর্তব্য, যা তবুও অতিমাত্রায় থেকে যাচ্ছে এখনও।

এর বিপরীতে বর্তমান উন্নয়নখাতে আসছে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর চেয়ে বরং অপ্রয়োজনীয় বিলাস ও ভোগ সামগ্রীর বিরামহীন পণ্য-বাজার। এতে অতি-দরিদ্রদের কিছু উপশম হলেও, যাদের অনেক আছে, তাদের জন্যই অত্যধিক বিলাস সামগ্রীতে বাজার উপচে পড়ছে। তাতে বাজারসামগ্রী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ব্যবহার, ফেলে দেওয়া, অপচয় করার আচরণ ও অশুভ কৃষ্টি এসে গেছে। এতে সৃষ্টির তথা "ভূমির ও মানুষের শ্রমের ফল"-এর প্রতি এত ভোগের চেতনায় কোন ভক্তিপূর্ণ মনোভাব আর থাকছে না এবং ব্যবহারকারী মানুষও অপরিচ্ছন্ন ভোগী ও লোভী মানুষ হয়ে যাচ্ছে। প্রভুর প্রার্থনায় "দৈনিক অন্ন" কথার মধ্যে জাগতিক সমস্ত প্রয়োজনের প্রতি যে পবিত্র মনোভাব থাকা প্রয়োজন, তা আর থাকছে না, বরং ভোগের "হাপুস-হুপুস" মনোভাব তীব্র হয়ে আছে।

"দৈনিক অন্ন" কথাটির মধ্যে আরও গভীর কথা হল যে, পৃথিবীর সমস্ত বস্তু-উদ্ভিদ-প্রাণ-প্রাণী নিজের জন্য নয়, বরং অন্যের জন্য প্রাণদায়ী "খাদ্য ও পানীয়" হয়ে জীবন ধারণ করছে। যা বিলীন হয়, মিছেমিছি শেষ হয় না, বরং অন্যের মাঝে, অন্যের জীবনে নিজের জীবনের আসলটুকু, অর্থাৎ হৃদয়টুকু খাদ্যরূপে দান করে চলে যায়। খ্রিস্টীয় শিক্ষায় সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর নিজেও যিশুর মধ্যদিয়ে এই জগতে "আত্মিক খাদ্য" হয়ে চলমান।

শেষ ধাপে এই জাগতিকতার অন্তর-দূষণ হল জগতের মানব ব্যক্তিকেই জড়-যান্ত্রিক জীবরূপে দেখার গ্লানী, যা মানব জীবনের ভীষণ আত্মিক দূষণ। বিশ্বের সমস্ত কিছুকে জড়-পদার্থ বলে বিবেচনা করতে গিয়ে বর্তমান মানব বিজ্ঞান নিজেকেও জড়-পদার্থ মাত্র বলে বিবেচনা করছে, যা মানবের জন্য ভীষণ আত্মিক গ্লানী।

মানুষের জীবন নিয়ে ২ ধাপে দূষণ বিশেষভাবে বিবেচ্য: প্রথমত, পৃথিবীর কোন কিছুই নিজ থেকে উদ্ভব হয় না, বরং অন্য কিছু থেকে আসে। প্রত্যেকটি মানুষও অন্য মানুষ থেকে আসে; প্রথম মানুষটি তার ঊর্ধ্বের সৃজনকারী সত্তা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর থেকে এসেছে। জড়-পদার্থের সাথে মানুষের সত্তার সহভাগ আছে বটে; তবে মানুষে শ্রেষ্ঠ প্রাণময়তা আসে তাঁর ঊর্ধ্বের সৃষ্টিকর্তার সর্বময় প্রাণময়তা থেকে। তাই শেষ ধাপে মানুষ জগতের জড়-পদার্থ ভিত্তি করে নয়, বরং ঊর্ধ্ব পরম আত্মাকে ভিত্তি কওে জীবন যাপন করে।

দ্বিতীয়ত, জগতের সমস্ত কিছু একক বিষয় হলেও কোন কিছুই এককভাবে চলমান বা জীবনময় নয়, বরং কয়েকটি এককে নিয়ে শুভ মিলনের মাধ্যমে "এক হয়ে" চলমান ও জীবনময় হয়। এমনকি বস্তু ও প্রাণীর যে ক্ষুদ্রতম "ডি-এন-এ", তা-ও ৪টি অনু ৫ম অনু হাইড্রোজেনের সংযোগে একটি ডি-এন-এ হয়। সৃষ্টির সকল বস্তু ও প্রাণী শুভ ও শ্রেষ্ঠ হয় যতটুকু তা অন্যের সাথে শুভভাবে মিলিত হয়ে "এক হয়"।

মানুষ আরও গভীর অর্থে শ্রেষ্ঠ জীব, কেননা সে নিজের মধ্যে দেহ-আত্মায় মিলনের জীব, আর সর্বোপরি সর্ব মানবের সাথে, সমগ্র সৃষ্টির সাথে এবং শেষে ঈশ্বরের সাথে মিলনের জীব। নিজের মধ্যে মিলনের শক্তিতে এক হওয়াতেই মানুষের আত্মিক শক্তি। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরও "একক নন", বরং তিন ব্যক্তির অনাদিকালীন মিলনে "এক ঈশ্বর", আত্মা ঈশ্বর।

বর্তমান যান্ত্রিক আচরণ মানুষকে একক করে দিয়ে তার মিলনের কৃষ্টিতে বিরাট বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে। মিলনের মানব না হয়ে বরং একক হওয়াই বর্তমানের মানবীয় জীবনের অসহনীয় আত্মিক দূষণ।

আ. দূষণ-বিজরিত ধরিত্রীর সংরক্ষণ ও ধরিত্রীর প্রতি ভক্তিপূর্ণ অনুরাগের আচরণ:

খ্রিস্টীয় কালের বিগত ২-হাজার বছরে কৃষ্টিগত ৩টি কাল বিবেচনা করা যায়: প্রথম কয়েক শতাব্দী ছিল ধর্মভিত্তিক যুগ, যখন সমাজ-রাষ্ট্র খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মীয় শিক্ষা অনুসারে চলেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে বেশ কিছু শতাব্দী ধরে মানব প্রজ্ঞা. প্রযুক্তি ও কার্যকলাপের যুগ, যা প্রথম দিকে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি একাত্ম ও নির্ভরশীল ছিল, তবে পরবর্তীতে মানুষ নিজেকে ঈশ্বর থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে, এবং শেষ পর্যায়ে ১৮শ শতাব্দীতে এসে ধর্মহীন, এমনকি ধর্মবিরোধী হয়ে ধর্মহীন সমাজরূপে কৃষ্টি গঠন করেছে। এর পরে তৃতীয় পর্যায়ে এসে ১৯-২০শ শতাব্দীতে সৃষ্ট হয়েছে মানব প্রযুক্তিভিত্তিক জাগতিকতার যান্ত্রিক যুগ, যাতে এসেছে কলকারখানাভিত্তিক বাজার ভোগ-পণ্যের বিস্তার। এতে শুভ মানবীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিবর্তে আসে জাগতিক ভোগ-পণ্যের যুগ। ২ হাজার বছরে প্রারম্ভিক ধর্মময় ও চিরন্তর ঐশরিক পথের যাত্রী পৃথিবী বর্তমান যুগে এসে শেষে পরিণত হল নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক ও ইহজগতের নিছক জড়-পদার্থের পৃথিবী রূপে। এই জড়তার গ্লানী থেকে সবার আবাসভূমি পৃথিবীকে আবার ধর্মময় ও প্রাণময় পৃথিবী রূপে রূপান্তরিত করে নিতে হবে।

বিগত ২-হাজার বছরের ইতিহাসে মাঝপথে এসে মানবীয় প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান ও কর্মময়তার বিকাশ খুবই ইতিবাচক বিষয় ছিল; আরও সুন্দরও ছিল যে মানবীয় প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান ও কর্মময়তা পৃথিবীর জাগতিক বিষয়গুলোকে সামনে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। তবে অতি পুরাতন সৃষ্টির মাঝে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সর্বময় প্রজ্ঞা, প্রযুক্তি ও কর্মময়তা থেকেই যে মানবীয় প্রজ্ঞা-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নেয়া হয়েছে তা থেকে বিচ্ছিন্ন না থেকে বরং তা নম্রভাবে স্মরণে রেখে এবং তার সাথে একাত্ম হয়ে চললে মানবীয় বিজ্ঞানের সাধনা ও কর্মযজ্ঞ শুভ হয়ে থাকবে।

মনে হয়, মানবীয় বিজ্ঞানের সামনে বর্তমানে সবচেয়ে বড় ভাবনা এই হতে হয়: যেখানে সবকিছুর "ডিজিটাল" অর্থাৎ এককে লক্ষ্য করে পৃথিবীর বস্তু ও মানুষকে "জড় পদার্থ" বলে মনে হয়, কেননা "ডিজিটাল" (একক) হল বস্তু বা প্রাণীর অনুর জড় অবস্থান। অপরপক্ষে বস্তু ও প্রাণী চলমান ও জীবনময় হয় যখন তার "ডিজিটাল" অর্থাৎ এককগুলি নির্ধারিতভাবে শুভ মিলনের মাধ্যমে "এক" হয়, তখন তার মাঝে তার "হৃদয়" বা আত্মাকে অনুভব করা যায়। বস্তু ও প্রাণীর "ডিজিটাল" অর্থাৎ এককে দেখা যথার্থ "জ্ঞান" বটে, তবে তা তাদের জড় অবস্থা নিয়ে জ্ঞান; যখন বস্তু বা প্রাণীর নির্ধারিত এককগুলির মিলনে "এক" হওয়াকে দেখা হয়, তখন সে জ্ঞান যথার্থ "বিজ্ঞান" হয়, কেননা তখন তা তাদের চলাচল বা জীবনময় হওয়া নিয়ে যথার্থ জ্ঞান। বর্তমান যুগে এসে মানবীয় বিজ্ঞানকে পৃথিবীর বস্তু ও প্রাণী সকলের "মিলনে এক হওয়া"-র বাস্তবতাকে সবিশেষ গবেষণা করে দেখতে হবে। তখন পৃথিবীর বস্তু ও প্রাণীকে নিছক পদার্থ বলে শুধু দেখবে না, বরং আরও দেখবে এক হওয়ায় তাদের হৃদয় ও আত্মাকে, দেখবে তাদের মাঝে মিলনে জীবনের শ্রেষ্ঠতা ও পবিত্রতাকে।

বর্তমান জাগতিকতা ও জড়-চেতনার যুগে এসে আমাদের সবাইকেই সমগ্র সৃষ্টির প্রতি এবং মানবীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমস্ত বস্তুর প্রতি জাগতিক ও ভোগদ্রব্যরূপ মূল্যবোধের ঊর্ধ্বে উঠে তাদের ভিতরের অর্থাৎ তাদের জীবনের মূল্যকেই প্রধান ও শ্রেষ্ঠ হিসেবে দেখতে হবে।

সৃষ্টির সময়ে ঈশ্বর নিজেই প্রথমত যেন নিজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, যেন বাহ্যিক কর্মময়তায় মগ্ন হয়ে, যেমন করছে আমাদের মানবীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। তবে সৃষ্টিকালে প্রতি দিনশেষে ও সপ্তম দিনে বাহ্যিক কর্মময়তা থেকে বিরতি নিয়ে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির প্রতি অন্তরের কর্মময়তায় অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে ধ্যানে আনন্দে, ভালবাসায়, যত্নে ও সংরক্ষণে, এমন কি ইতিহাসে ক্ষমায় ও মুক্তিদানে রত হয়েছেন। বাহ্যিক ক্রিয়া থেকে বিশ্রাম সময়ে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির প্রতি অন্তরের ক্রিয়ায় সদা মগ্ন রয়েছেন। বর্তমান মানুষ "২৪/৭" ঘণ্টা-দিন বাহ্যিক কর্মে সদা নিরত থাকছে; এর মাঝে তাকে অনেক সময় নিয়ে সর্ব সময়েই যেন অন্তরের কর্মেও মগ্ন থাকতে হবে।

বাহ্যিক ভোগ-বিলাসের কর্মে বিক্ষত মানুষকে তার নিজের জীবনের প্রতি, ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি ও তার নিজের হাতের সৃষ্টির প্রতি অন্তরের পবিত্র বিশ্রামের ক্রিয়ায় ধ্যানে আনন্দে, ভালবাসায়, যত্নে ও সংরক্ষণে, এমন কি ক্ষমায় ও মুক্তিদানে নিরত হতে হয়।

এভাবেই বর্তমান যুগের ধর্মবিমুখ মানুষ হতে পারে সহজ ধর্মপ্রাণ মানুষ। বর্তমান মানুষের অন্তরের ধ্যান যেখানে জাগতিকতা ও ভোগ-বিলাসিতা, তাকে তার হৃদয়-অন্তরে নিয়ে আসতে হবে ঈশ্বরের সৃষ্টির, তার নিজের জীবনের ও তার হাতের সৃষ্টির প্রতি পবিত্র অনুরাগ ও ধ্যান। ভক্তি ভাব দিয়ে মানুষকে তার হৃদয়-অন্তরে গেঁথে রাখতে হবে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিকে, তার মাঝে অতিশয় আপন করে রাখতে হবে ধরিত্রী আবাসভূমিকে। সেই ধ্যানে ধরিত্রী এবং ধরিত্রীর প্রতিদিনের সকল দান ও আশীর্বাদ মানুষের অন্তরে প্রার্থনার মত হয়ে বিরাজ করবে।

ধরিত্রীর প্রতি এই সহজ ভক্তিভাব ও অনুরাগই হবে ধরিত্রীর বিজ্ঞান জগতের, ধর্ম জগতের, এমনকি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী জগতের মানুষের জন্য প্রতিদিনের সহজ-সরল সাধারণ ধর্মাচরণ ও পবিত্রতা॥

খোলা জানালা

কপ ২৬: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

বিশপ জের্ভাস রোজারিও

গত ৩০ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর স্কটল্যান্ডের রাজধানী গ্লাসগো শহরে (গ্রেট ব্রিটেন) কপ ২৬ (COP 26) বা জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেখানে প্রায় দুইশত দেশ থেকে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি চৌকষ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় অধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির ফোরামের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমাদের প্রধান মন্ত্রী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এই কনফারেন্স অব দা পার্টিস্ (26th Conference of the Parties) বা কপ ২৬ সম্মেলনে। সেখানে বাংলাদেশের বেসরকারী সংস্থাগুলি থেকেও অনেক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের সরকার বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতিকর বিষয়গুলি নিয়ে উদ্বিগ্নতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। কারণ বায়ুমণ্ডলে উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে উত্তরের হিমালয়সহ অন্যান্য পর্বতের বরফ গলে গিয়ে নদী হয়ে সমুদ্রে পড়ছে, যার ফলে সমুদ্র-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি আরও দ্রুত গতিতে সমুদ্রের জল বৃদ্ধি পায় তাহলে আগামী কয়েক দশকে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল জলের নীচে চলে যাবে। তাতে বাংলাদেশে বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি হবে; বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে আর বিপুল সংখ্যক মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিবাসী হবে। এই অভিবাসনের ঢেউ শুধু বাংলাদেশেই নয়, তা গিয়ে আছড়ে পড়বে অন্যান্য দেশেও, বিশেষভাবে আশেপাশের দেশগুলিতে। তাতে তৈরী হবে জাতিগত টেনশন ও সংঘাত, যা কারোরই কাম্য নয়।

বিশ্বের সকল দেশেই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে আরম্ভ করেছে। মানুষের উন্নাসিক ভোগবাদী ও অপরিনামদর্শী আচরণের ফলে এই পৃথিবী বা ধরিত্রী আজ অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে - বর্তমানে যার পরিমাণ প্রায় ২.৫ সেলসিয়াস। এখন ভূমিকম্প, সুনামী, ঝড়-ঝঞ্ঝা, সাইক্লোন বা টর্নেডো, খড়া বা অতিবৃষ্টি, গরম ঋতু পরিবর্তন, ও শীতের প্রকোপ, ইত্যাদি আমাদের সকলকেই ভাবিয়ে তুলছে। এখনই বিচক্ষণ ও সাবধানী পদক্ষেপ না নিলে আমাদের এই পৃথিবীর সকল মানুষের পরিনাম হবে ভয়াবহ।

এই সব কিছু হচ্ছে কারণ মানুষের অতি লোভ ও মাত্রাতিরিক্ত লালসা চরিতার্থ করার প্রবণতা। পৃথিবীর দেশে দেশে বনভূমি উজার হয়েছে ও হচ্ছে; অতিমাত্রায় পৃথিবীর খনিজ সম্পদ উত্তোলন করা; কলকারখানা, আনবিক চুল্লি ও ইটভাটি থেকে অতি মাত্রায় কার্বন নিসরণ; জলাশয় ও নদ-নদী দুষণ, ইত্যাদি চলছেই। ঈশ্বরের সকল সৃষ্টি ও ধরিত্রীর প্রতি যত্ন বা ভালবাসার চাইতে এখন মানুষের লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক লাভ ও লোভ। ভোগবাদী মানুষের সীমাহীন ভোগের নেশা মিটাতে পৃথিবী এখন ফতুর হতে চলেছে।

বাংলাদেশের মত পৃথিবীর অনেক দেশই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের শিকার হয়েছে ও হচ্ছে। এই কারণে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে: ঋতু প্রকৃতি বদলে গেছে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ইত্যাদি এখন আর কোন নিয়ম মেনে চলে না। বাতাসে ও প্রকৃতিতে কার্বনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় উষ্ণতা বেড়েছে আর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে উত্তর মেরুর বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের জল বেড়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই অনেক দ্বীপ দেশ পানির নীচে তলিয়ে গেছে। বাংলাদেশের মত অনেক ছোট ছোট দেশ ধীরে ধীরে পানির নীচে তলিয়ে যাওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অথচ এর জন্য ছোট ও দরিদ্র দেশগুলি দায়ী নয়, এর জন্য দায়ী শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কার্বন নি:সরণ করে থাকে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়ার মত ধনী দেশগুলি। কানাডা, ইউরোপের দেশগুলি ও এশীয় কিছু শিল্পোন্নত দেশ কার্বন দূষণের জন্য সমানভাবেই দায়ী। কিন্তু তাদের মধ্যে সেই চেতনা কিছুই নেই। তাদের লক্ষ্য আরও ব্যবসা, আরও লাভ। তাদের এই লোভের বলি হতে হচ্ছে বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশগুলিকে। সেই জন্য **কপ** সম্মেলনগুলিতে দাবি জানানো হয়ে আসছে যেন ধনী দেশ, বিশেষত যেসব দেশ কার্বন নি:সরনের জন্য বেশি দায়ী, তারা যেন দরিদ্র ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলিকে ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থ দান করে এবং এই উদ্দেশে বিলিয়ন বা ট্রিলিয়ন ডলারের ফাণ্ড গড়ে তোলে। আজ পর্যন্ত অবশ্য ধনী দেশেগুলি, বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন, অর্থ ছাড়ের ব্যপারে কোন নমনীয়তা বা আগ্রহ দেখায়নি। দরিদ্র দেশগুলি ও এন.জি.ও.গুলি অব্যাহতভাবে দর কষাকষি করেছে ফলে কিছু অর্থ ছাড় হয়েছে, যা বলা যায় একেবারেই নস্যি।

দরিদ্র দেশগুলিকে অর্থদানের ব্যপারে ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলি যে তেমন কিছু করবে, তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাহলে দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলি এখন কি করবে বা করতে পারে তা তাদের ভেবে দেখতে হবে। ধনী দেশগুলির কার্বন নি:সরণের ফলে বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশগুলি যে ক্ষতি হয়েছে বা হচ্ছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু তারা নিজেরা কি এর জন্য কিছু মাত্র দায়ী নয়? তারা নিজেরাও কিন্তু কম দায়ী নয়। একটা দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ঠিক বা স্বাভাবিক থাকার জন্য সেই দেশে ২৫% বনাঞ্চল থাকা দরকার - কিন্তু বাংলাদেশে বা ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলিতে কি সেই পরিমাণ গাছ আছে? তা নিশ্চিতভাবেই নেই। আমাদের দেশের মানুষই গাছ কেটেছে, বিদেশী কোন রাষ্ট্র বা সংস্থা নয়। তাছাড়া আমাদের দেশের কলকারখানা ও ইটের ভাটা থেকে অবিরাম কার্বন নি:সরণ হচ্ছে। আর এগুলির বর্জ্য বা পারিবারিক ও সামাজিক আবর্জনা আশেপাশের পরিবেশকে দূষিত ও নোংরা করে ফেলছে। এতে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর ও বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বিদেশীরা কিন্তু আমাদের দেশের গাছ কাটেনি বা আমাদের দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, ইত্যাদি নোংরা করেনি। আমরাই তা করেছি। বিদেশীরা প্লাষ্টিক বর্জ্য যত্রতত্র ফেলে পরিবেশের ক্ষতি করেনি। তাহলে এইসব বিষয় নিয়েও জোরের সাথে কথা বলা দরকার আর কাজ করাও দরকার।

তাহলে এখন আমরা কি করব? আমরা অবশ্যই শিল্পোন্নত ও ধনী দেশগুলির কাছে তাদের শিল্প বা কলকারখানায় কার্বন নি:সরণের দ্বারা বিশ্বের পরিবেশের যে ক্ষতি করেছে তার জন্য ক্ষতিপূরণের হিস্যা চাইব। সেই সাথে আমাদের দেশে যেন কার্বন নি:সরণ সীমিত রাখা যায় সেই চেষ্টাও করতে হবে। কালকারখানায়, ইটের ভাটা, মোটর গাড়ী ও গৃহস্থালি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি থেকে যে গ্যাস ও কার্বন উৎগীরণ হয় তা সীমিত রাখতে হবে। বর্জ্য বা আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। ফসিল (Fossil) তেলের ব্যবহার কমিয়ে জল, সৌর ও বায়ু বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়াতে হবে। জনগণকে পরিবারে ও সমাজের পরিবেশের যত্ন, গাছ লাগানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা ও সচেতনতা দিতে হবে। গাছ কাটা যেন বন্ধ হয় সেই জন্য আমাদের সকলের জীবন ধারা পরিবর্তন করতে হবে ও জৌলুসপূর্ণ জীবন ছেড়ে সাধারণ জীবন যাপন করতে হবে। কারণ আমাদের ভোগবাদী মনোভাব সব সময়ই পরিবেশের উপর চাপ সৃষ্টি করে। আমরা যদি দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের মনোভাব ও জীবন ধারা পরিবর্তন না করি বা সৃষ্টির যত্ন না করে ধ্বংস করি, কিভাবে আমরা অন্যদের দোষারোপ করতে পারি? আমাদের দায়িত্ব হল প্রথমে নিজেদের দেশের মধ্যে ঈশ্বরের সকল সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের যত্ন করা। বাংলাদেশকে সবুজ ও পরিচ্ছন্ন করা ও রাখার মধ্য দিয়ে আমাদের ক্রেডিবিলিটি অর্জন করা। তবেই আমরা বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে বিশ্বের ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলির কাছে তাদের দ্বারা সাধিত ক্ষতির হিস্যা চাইতে পারি॥

খোলা জানালা

একাত্তরের রণাঙ্গনের শেষ ঠিকানা

চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু

সে যুগের ভাওয়াল রাজ্যের দক্ষিণ এলাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র একটি গ্রামের নাম রাঙ্গামাটিয়া। গ্রামটির মাটি রঙ্গিন নয় বটে! যারা এ মাটির সন্তান জন্মগত ভাবেই এরা স্বাধীনচেতা, প্রতিবাদি, বিপ্লবী এবং ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় তৎপর। বাংলাদেশ গড়ায় মুক্তিযুদ্ধে এরা গর্বিত অংশীদার। তৎকালিন ফরিদপুর এলাকার ভূষণা রাজ্যস্থ অরিকূল ও লড়িকূল এলাকা থেকে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে আগত পর্তুগীজ মিশনারীদের মধ্যস্থতায়, এরা ধর্মান্তরিত এবং স্বীকৃত দোম আন্তনিও খ্রিস্টভক্ত। অক্ষরজ্ঞানে শিক্ষিত না হলেও ভিনদেশী ধর্মীয় যাজকদের আদর্শে গড়ে উঠার কারণে, এরা সংস্কৃতিগতভাবে খ্রিস্টীয় আদর্শে নিজস্ব সভ্যতাকে সদা ও সর্বত্র জাগ্রত রেখেছিলেন। সে যুগের সমাজ ব্যবস্থা এবং ঐশ চেতনায় গড়া, প্রচলিত নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ধর্মীয় উৎসবে, বিশেষতঃ বড়দিন ও পুনরুত্থান পার্বণে, প্রায় প্রতিটি ধর্মপল্লী চত্বরে গান-বাজনা, কীর্তন, যাত্রাগানের পালা থেকে নাটকাভিনয়ে, অজপাড়াগাঁয়ে বাস করেও এরা যথাযথ সাংস্কৃতিক মননশীলতা এবং বিভিন্নমূখী কর্ম দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

তৎকালিন ভাওয়াল তথা বৃহত্তর ঢাকা জেলার সর্ববৃহৎ বিলের নাম বেলাই বিল। এর দক্ষিণ এলাকাটি ছিলো গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত। গঙ্গা সাগরের পূর্বাঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছিলো জয়রামবের গ্রামসহ রাঙ্গামাটিয়া, বান্দাখোলা, দড়িপাড়া, নলছাটা, পিপুলিয়া, করান ও নাগরী। বিশাল এ জলাভূমির মানুষ সে যুগে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তাল গাছের ডোঙ্গা, কোঁশা ও নৌকায় চড়ে বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াত করা ও নিজেরা সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করতেন। বেলাই বিলের পশ্চিম উপকূল ঘিরে কয়ের, পূবাইল ও বারিয়া (বাইরা) গ্রাম গড়ে উঠেছিলো [ফাদার এইচ, হোস্টেন, এস জে, "কাথলিক হেরাল্ড অব্ ইন্ডিয়ায় বর্ণিত ১৬৬৩-১৭৫০, "ঢাকার খ্রিস্টানদের ধর্মান্তরিত হওয়ার সংক্ষিপ্ত চিত্র"তে পাওয়া রচনা, প্রকাশকাল: ১৯১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দ]। উল্লেখিত গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেশকিছু খ্রিস্টান পরিবার পরিদর্শনকালে ফাদার হোস্টেন নিজে দোম আন্তনিও দা' রোজারিও প্রতিষ্ঠিত গ্রামগুলো সফর করেছেন। এ সকল গ্রামের অধিবাসীরা পর্তুগীজ নিয়ম-কানুনে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলেন। ভিনদেশী যাজকদের সংস্পর্শে থাকায় ভাওয়ালের অক্ষরজ্ঞানহীন খ্রিস্টান সমাজ আধুনিক সভ্যতার মানদণ্ডে, যথাযথ একটি মর্যাদার স্থানে উপবিষ্ট হয়েছিলো।

ইতিহাসের অতীত প্রভাব বিবেচনা থেকে জানা যায় পদ্মা নদীর ভাঙ্গনে গৃহহারা জনতা, ভূষণা রাজ্যের অরিকূল-লরিকূল এলাকা পরিত্যাগ করে, এদের একাংশ শেষ পর্যন্ত রাঙ্গামাটিয়ায় স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিলেন। লোক কথার গল্প থেকে জানা যায়, রাঙ্গার মার পোষা টিয়াটি হারিয়ে যাবার পর, তার লোকেরা টিয়া পাখিটি যেখানে খুঁজে পেয়েছিলেন, তার নাম রাখা হয়েছিলো "রাঙ্গামাটিয়া"। নতুন গির্জা প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েক বৎসর পূর্বে এ গ্রামে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। পরবর্তীতে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীস্থ বর্তমান কনভেন্ট সীমানায়, ভাওয়াল রাজার দানকৃত জমিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়। স্কুলটি ভালোই চলছিলো বটে! ক্ষুদ্র অপরাধকে কেন্দ্র করে বিনা দোষে একজন শিক্ষকের চাকুরীচ্যুতি ঘটলে কোন্দল ও দলাদলির কারণে গ্রামবাসীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। অতঃপর, অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সূত্র ধরে কতিপয় মাত্বরের মধ্যস্থতায়, এ গ্রামে ব্যাপ্তিষ্ট মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়। নানা ঘটনার মূল থেকে জানা যায় এ গ্রামের অধিবাসীগণ অত্যন্ত স্পষ্টবাদী, প্রতিবাদী এবং বিদ্রোহী চরিত্রে গড়ে উঠেছিলেন।

নানা ঐতিহ্যে ধন্য রাঙ্গামাটিয়ার সন্তানদের অনেকেই ইংরেজ আমলে, নবাবগঞ্জের বান্দুরা হলিক্রস স্কুলে ও পর্তুগীজদের প্রভাবে গড়ে উঠা নাগরীতে প্রতিষ্ঠিত টলেন্টিনোর সাধু নিকোলাসের বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন। যাজকতন্ত্রের প্রভাবধন্য কিছু কিছু সদস্য তৎকালিন কোলকাতায় ইংলিশ মাধ্যমের বিদ্যালয়েও পড়াশোনা করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। ভাওয়াল রাজার অধিনস্থ এলাকায় কিছু বুদ্ধিদীপ্ত খ্রিস্টান পরিবার তালুকদারীত্ব লাভ করেছিলেন। তালুকদারী সম্পত্তির অংশে জমি দান করতঃ "রিবেরু" পরিবার, তৎকালিন মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের সাথে সৎ ভাব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন বিধায়, এ বংশের অনেকেই তৎকালিন কোলকাতায় ইংরেজী মাধ্যমের স্কুল থেকে বিদ্যার্জন করেছেন এবং এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মণ্ডলীর সাথে সু-সম্পর্ক থাকায় রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী বাসীদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজন যাজক ও ব্রতধারী হয়ে উঠেছিলেন। ফাদার মাইকেল ডি' কস্তা (মন্সিনিউর), ফাদার যাকোব দেছাই, ফাদার আলেকজান্ডার ডি' কস্তা (আলিচাঁন্দ), মন্সিনিউর পিটার এ গমেজ, ফাদার পিটার দেছাই, ফাদার এলিয়াস রিবেরু, সিষ্টার মড্ জীতা রিবেরু আরএনডিএম, সিস্টার আগষ্টা কোড়াইয়া আরএনডিএম, ব্রাদার লরেন্স গমেজ সিএসসি, স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে এরা সে যুগের রাঙ্গাফসল হয়ে উঠেন। এদের পথ ধরেই বাংলাদেশের তৃতীয় আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা, ময়মনসিংহের প্রথম বিশপ ফ্রান্সিস এ গমেজ এ মাটি থেকেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। অপরদিকে কাটেখ্রিস্টদের মাঝে নাগর রিবেরু, মনাই আন্তনী ডি' কস্তা, সিসিল রিবেরু, ভিনসেন্ট ডি' কস্তারা প্রৈরিতিক কার্যে অংশগ্রহণ করে সমাজে মাষ্টার নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। পাশাপাশি যারা গণমুখি শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন, তারা পণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন। ম্যাথু পণ্ডিত ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত ম্যাথিয়াস ডি' কস্তা, মার্টিন ডি' কস্তা (ভাওয়ালের প্রথম গ্রাজুয়েট বি.এ পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেন) রুমেল কাঙ্গালি ডি' কস্তা, (পণ্ডিত) সহ মহিলাদের মাঝে চন্দ্রমুখী মার্থা রিবেরু, সিসিলিয়া গমেজ, আগ্নেশ ডি' কস্তা, লুসী গমেজ, আগ্নেশ রিবেরু, আগ্নেশ কস্তা (গায়েন) শিক্ষকতা পেশায় এবং জ্ঞান বিতরণে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী গড়ায় বিশেষ অবদান রেখে গেছেন।

সমাজ পরিচালনায় সামাজিক সালিশী, বৈঠক বসানো এবং ন্যায় বিচার ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায়, ভাওয়াল এলাকায় এ গ্রামের বেশকিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নেতৃত্বের জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এদের মাঝে ধনাই ডি' কস্তা, আলি সরকার (সে যুগের নির্বাচিত মেম্বার) আলি ডি' কস্তা, বিলু কস্তা, যাকব কোড়াইয়া, জিমি গমেজ (মাহুইট্টা), ম্যাথুপণ্ডিত, নাগর পণ্ডিত, কাঙ্গালি পন্ডিত, কেরু ডি' কস্তা (ভূঞা), নিকল কস্তা, ফ্যালু রিবেরু (টুণ্ডা), জাজি রিবেরু,

পিয়ব রিবেরু, মংলা কস্তা (ভূঞা), আকালি রড্রিক্স (কুলু), পিতর ভূঞা, যাক্ন ভূঞা, ন্যার্য্য মাতব্বর, ডেঙ্গুরা কস্তা, তারামন রিবেরু (সরকার), সদানন্দ রিবেরু, ফেরু ফ্রান্সিস কস্তা, কাফু গমেজ, নাগর (মাষ্টার) রিবেরু, মাথিয়াস রিবেরু, যোসেফ পালমা (জোলা), রাফায়েল রিবেরু, ডেঙ্গু গমেজ, টমাস গমেজ, চার্লি সরকার, আলি রোজারিও (গজার), পলু বুইড্ডা, যোসেফ গেদা বুইড্ডা, বিছান্তি ভুইড্ডা, বিছান্তি মেনি, পৌল কস্তা বুইড্ডা, এ্যাড্‌বিন কস্তা, যেরুম কস্তা, বাবু ডাঙ্গি, বিছান্তি পণ্ডিত, লাফন্ড গমেজ, যাকব গমেজ, ফিলিপ ডাঙ্গি, ক্লেমেন্টে গমেজ (গোছাল), ফেলু রিবেরু (নড়ছের বাড়ী), জাজি রিবেরু, আলি সর্দার ডি' ক্রুজদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাওয়াল রাজা সন্ন্যাসী, সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির সম্বোর্ধনা আসরে বৈঠকী গান গেয়ে, নাগর রোজারিও স্বনামধন্য গায়কে পরিণত হন। অতঃপর, তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে পিটার রিবেরু, এড্‌বিন ডি' কস্তা, টমাস ডি' কস্তা, ক্লেমেন্ট কস্তা ভূঞা, রবি কোড়াইয়া এলাকা মাতানো জনপ্রিয় গায়কের ভূমিকায় অবতরণ করেন।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব-পশ্চিম প্রদেশগুলোর সমন্বয় রক্ষায় ইংরেজীকে কেন্দ্রীয় ভাষা রেখে, সংখ্যাগুরু মানুষের ভাষা বাংলাকে প্রাদেশিক ভাষার মর্যাদা দানের প্রস্তাব করা হলে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে, পাকিস্তান জাতির পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তা আমলে না নিয়ে উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করার নির্দেশ দিলে, পূর্ব বাংলার সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় উঠে। অতঃপর, মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠায় ছাত্র গণআন্দোলন তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের চলমান ধারা বিবর্তনে, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি, পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার শহীদ হলেন। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ঢাকায় হরতাল আহ্বান করলে ২২ ফেব্রুয়ারী, "মর্নিং নিউজ" পত্রিকায় ছাত্রদের প্রতিকূলে সংবাদ পরিবেশন করার কারণে, "জুবিলী প্রেস" ও পত্রিকার কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী তখন মাসিক পত্রিকা হিসেবে জুবিলী প্রেসে মুদ্রিত হতো। ফলে সেদিনই প্রতিবেশীর ঐতিহাসিক দলিল ও প্রয়োজনীয় অনেক কাগজপত্র ইতিহাসের অন্ধ গুহায় বিলিন হয়ে যায়। প্রতিবেশীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রাঙ্গামাটিয়ার সন্তান ফাদার যাকব দেছাই ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ সমর্থন করে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে তিনি লিখেছেন, "প্রতিবেশী তার এই দীনতার বেশে বাংলাকে রাষ্ট্রা ভাষা করার দাবীতে নিহত, আহত ও বন্দীকৃত ছাত্রদেরকে এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। আমাদের "প্রতিবেশী"র মুখের ভাষা বাংলা: তাই তার একমাত্র গর্বের বস্তু বাংলা। কাজেই যা তার গর্বের বস্তু, তার গৌরবের জন্য আত্মত্যাগীদের প্রতি তার সহানুভূতি থাকবেই। এরজন্য তাকে দোষ দেওয়া চলে না.....।" *(বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী)* এ সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার পর থেকে কথিত অরাজনৈতিক খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়কে কেন্দ্রীয় সরকার সুদৃষ্টিতে দেখছিলেন না।

মাতৃভাষায় কথা বলার দাবীতে সকল স্তরের জাগ্রত বাঙালির সাথে স্বদেশী খ্রিস্টভক্তরাও নিজেরা বাঙ্গালি খ্রিস্টান বলে দাবী করার সুযোগ লাভ করেন। বাঙ্গালি রাজনীতির ধারাবাহিকতায় সে যুগের সচেতন ছাত্র-যুব সমাজ কিছু কল্যাণধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করে, সংগঠন গড়া, নেতৃত্বদান ও পরিচালনার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ধর্মপল্লীর উন্নয়নে যুব কার্যক্রম হাতে নিয়ে, তৎকালিন যুব সমাজ প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্ম পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করে। সাংগঠনিক দক্ষতা থেকে রাজধানীতে এসে জাতীয় পর্যায়ের সংগঠন "খ্রীষ্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘ" প্রতিষ্ঠায় চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু এবং লুইস অনিল কস্তার উদয় ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে চিত্ত ফ্রান্সিস তৎকালিন ঢাকা শহরের একজন পরিচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণী প্রতিনিধি, হল সংসদে ছাত্রলীগ মনোনীত প্রার্থী এবং ডাকসুতে মনোনীত হয়ে তিনি স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হলে, জাতীয় রাজনীতিতে সম্প্রদায়গত শূণ্যস্থানটি পূরণে তিনি রাজনীতিতে এগিয়ে আসেন এবং তারই প্রভাবে তৎকালিন অজপাড়াগায়ে রাঙ্গামাটিয়ার নামটিও জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ৭ ডিসেম্বর, পাকিস্তানে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘোষণার পর এদেশের রাজনীতিতে ছাত্র-যুব সমাজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। নির্বাচনী প্রচার সভাগুলোতে ছাত্রলীগ নেতা মি. রিবেরু তার সামাজিক পরিচিতির কারণে এলাকার বিভিন্ন জনসভায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক মঞ্চে রাঙ্গামাটিয়ার স্বনামধন্য যুবক অংশগ্রহণ করার কারণে, পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে আরম্ভ করে।

১৯৭১ এর ১ মার্চ, জাতির উদ্দেশে ভাষণে তৎকালিন সামরিক সরকার প্রধান, জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খাঁন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতীয় বেঈমান উল্লেখ করে ভাষণ দিলে, সারাদেশের ছাত্র-জনতা প্রতিবাদের বিপ্লবী ঝড় তুলে রাজপথে নেমে আসেন। ছাত্র রাজনীতির সূতিকাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ "ডাকসু" ২ মার্চ, ঐতিহাসিক বটতলায় প্রতিবাদ সভা আহ্বান করে। পরবর্তী দিবসে ৩ মার্চ, ছাত্রলীগ পল্টন ময়দানে আরেকটি প্রতিবাদ সভা আহ্বান করে। ২ মার্চ, ডাকসুর প্রতিবাদ সভায় লাখো জনতার উপস্থিতিতে ডাকসু সহ-সভাপতি আ.স.ম আবদুর রব, ডাকসু সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন, ছাত্রলীগ সভাপতি নূর এ আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, জগৎ মাতানো বিপ্লবী ভাষণে সেদিন বাংলার আকাশ-বাতাস আন্দোলিত করে তোলেন। অতঃপর, ছাত্রলীগ নেতা শিব নারায়ণ দাসের নক্‌শায় সবুজ জমিনে লাল সূর্য এবং হলুদ রঙ্গের মানচিত্রে প্রস্তুতকৃত স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী পতাকা, ডাকসুর প্রতিবাদ সভায় উত্তোলন করেন আ.স.ম আবদুর রব এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন শাজাহান সিরাজ। ঐতিহাসিক এ মহাসভায় রাঙ্গামাটিয়ার সন্তান চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু উপস্থিত থেকে, স্বাধীন দেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক আকাশে আত্মপ্রকাশ করেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রকাশ্য প্রস্তুতি সভায় একজন দেশীয় খ্রিস্টান ব্যক্তির উপস্থিতি বাংলাদেশের খ্রিস্টীয় সমাজকে সেদিন ধন্য করেছিলো।

গণআন্দোলনের ধারা পাল্টে ৭ মার্চ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন এবং স্বাধীনতার পথে বাঙ্গালি জাতির নবযাত্রার পথ সুগম হয়। অতঃপর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলন, মার্চ মাসব্যাপী বিপ্লবের ধারা দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হতে থাকে।

স্বাধীনতার লক্ষ্যে গণবিস্ফোরণ চলাকালে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, জয়দেবপুর সেনানিবাসে অবস্থানরত ২য় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করা হবে। ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বাঙালি সৈনিকদের মধ্যে যখন বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠে, সাধারণ মানুষ তাদের পক্ষ সমর্থন করে মিছিল করা অব্যাহত রাখে।

সাবেক ছাত্রনেতা আ.ক.ম মোজাম্মেল হককে জয়দেবপুর এলাকার আহ্বায়ক করে মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদে ছিলেন, ডাক্তার সাঈদ বক্স ভূঁইয়া, মোঃ শহীদুল্লাহ বাচ্চু, মোঃ হারুন অর রশিদ ভূইয়া, শহীদুল ইসলাম পাঠান, মোঃ নূরুল ইসলাম, মোঃ আয়েশা উদ্দিন, মোঃ আবদুস সাত্তার মিঞা, মোঃ হযরত আলি, শেখ আবুল হোসেইন প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন গড়ায় ছিলেন তৎকালিন সংসদ সদস্য মোঃ শামসুল হক। ১৯ মার্চ, ঢাকা থেকে পাঞ্জাবী বাহিনী, বাঙ্গালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে আসছে জেনে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতা, অস্ত্র জমা না দেবার পক্ষপাতি ২য় রেজিমেন্টের সহ-অধিনায়ক মেজর কে.এম. শফিউল্লাহকে সমর্থন দেয় এবং চৌরাস্তায় পাক-বাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধ বেধে গেলে জনতা পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সম্মুখযুদ্ধের সংবাদ ঢাকায় পৌঁছলে তাৎক্ষণিক স্লোগান উঠে, "জয়দেবপুরের পথ ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।"

১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট কার্যক্রমের বিকল্প প্রস্তুতি গ্রহণ করলে, এলাকার জনতা জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘিরে প্রতিবাদ জানায়। বিগ্রেডিয়ার জাহান জাজ আরবার খাঁন বিপ্লবী জনতাকে ব্যারিকেড তুলে নেবার নির্দেশ দিলে জনতার বাধায় বাঙ্গালী সৈনিকরাও তাদের পক্ষে দাঁড়ান। অতঃপর, উভয় পক্ষের গোলাগুলিতে ছদ্মবেশী বাঙালি সৈনিকরা ১৯ মার্চ, জনতার পক্ষ থেকে গুলি ছুড়লে, উভয় পক্ষের যুদ্ধে নিয়ামত নামের একজন কিশোরসহ মনু মিঞা, সন্তুষ মল্লিক, কানু মিঞা ও ইউসুফ আহত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনাস্থলে হুরমত আলী শহীদ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে প্রথম প্রহরেই শহীদ হয়েছেন। আহত ছদ্মবেশী বাঙালি সৈনিকগণ পদ ব্রজে রাঙ্গামাটিয়া, চড়াখোলা, দড়িপাড়া, নাগরী হয়ে নিজ গ্রামে পৌঁছার সময় ভাওয়ালবাসীদের হৃদয় মারাত্মকভাবে স্পর্শ করেছিলো এবং রাঙ্গামাটিয়ার যুব সমাজে প্রত্যক্ষিত হৃদয়বিদারক এ ঘটনায় খ্রিস্টানদের মনেও মারাত্মক রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

জয়দেবপুর চৌরাস্তায় সংগঠিত সম্মুখ যুদ্ধের সংবাদ ঢাকায় পৌঁছলে স্লোগান উঠে "জয়দেবপুরের পথ ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর"। পূর্ব বাংলার সকল নগর, বন্দর, বাজার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপোষহীন সংগ্রাম ও স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। অতঃপর, ২৩ মার্চ পাকিস্তানের গণপ্রজাতন্ত্র দিবসে, জাতির পিতার হাতে স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী পতাকা হস্তান্তর করা হয়। ২৫ মার্চ ভুয়া আলোচনা সভা সমাপ্ত করে জেনারেল ইয়াহিয়া ও জুলফিকার আলী ভুট্টুসহ পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ ত্যাগ করলে, গভীর রাতে নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর আঘাত করে, পাকিস্তানী দস্যু সেনাবাহিনী বাংলাদেশকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। দিবাগত রাত ২৬ মার্চ, জাতির পিতাকে গ্রেফতার করতে গেলে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশকে মুক্ত করার নির্দেশ দেন।

১৭ এপ্রিল, ১৯৭১, মুজিব নগর সরকার গঠনকালে রাঙ্গামাটিয়ার সন্তান ফাদার ফ্রান্সিস এ গমেজ (ময়মনসিংহের প্রথম বিশপ), নবগঠিত বিপ্লবী সরকারের মন্ত্রী পরিষদ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের ছবি তোলেন। গুরুত্বপূর্ণ মহান এ সভায় নেতৃবৃন্দের পক্ষে তিনি ব্যবহার্য আসবাবপত্রাদি সরবরাহ করেছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বাঙালি খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে এ সকল আলামত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে যথাযথ অর্থবহ এবং গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছিলো।

ইতিপূর্বে, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচার সভায় গাজীপুর জেলার বর্তমান উপজেলা, কালীগঞ্জের নাগরী সেন্ট নিকোলাস হাই স্কুলের সাবেক ছাত্র, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্বনামধন্য সাধারণ সম্পাদক তাজ উদ্দিন আহমদের উপস্থিতিতে, উক্ত স্কুলের শিক্ষক ভিনসেন্ট রড্রিক্স এবং ছাত্রলীগ নেতা চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু বক্তব্য রেখেছিলেন বিধায় দেশীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায় অতি দ্রুত বাঙালির আন্দোলনে এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলো।

২৫ মার্চ নিরপরাধী, নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর পকিস্তানী বর্বর বাহিনীর আক্রমনের প্রতিবাদে একদিন পরেই বিপ্লবী ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, সর্বস্তরের মানুষ, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য ভারতের সীমানা অতিক্রম করেন এবং ভারত সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে ও প্রশিক্ষণ শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের কালু ঘাট রেডিও সেন্টার থেকে ২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করা হয়। মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণাপত্রটি বালু ঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ করেছেন। অতঃপর, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দামাল ছেলেরা গুপ্ত হামলায় খন্ড যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সংবাদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয় এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রই তখন জনতার মনোবল ধরে রাখার ব্যবস্থা করে আতঙ্কিত জনতার মনোবলকে উৎসাহ যুগিয়ে ছিলো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সংগঠিত মুক্তিবাহিনী ভাওয়াল এলাকায় পৌঁছে গেলে, সর্বপ্রথম তুমিলিয়ার সমর লুইস কস্তা এবং নাগরীর সন্তোষ রড্রিক্সের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখে উৎসাহী খ্রিস্টান যুবকরা আগরতলা যাবার পথ আবিষ্কার করেন এবং দলে দলে ভারতে গমন করতে থাকেন।

স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রিয় সদস্য চিত্ত ফ্রান্সিসের কারণে, রাঙ্গামাটিয়াসহ বিভিন্ন হিন্দু-মুসলমান ও খ্রিস্টান গ্রামের সবার বাড়িতে বাংলাদেশের মানচিত্রে গড়া নতুন পতাকা শোভা পায়। পাকিস্তান আন্দোলনে যেহেতু বাঙালি খ্রিস্টানদের কোন সক্রিয় ভূমিকার কথা জানা যায়নি, সেহেতু ছাত্রলীগ নেতার মনে বাংলাদেশ গড়াকালে একটি কুটবুদ্ধি জাগে। তৎকালিন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উড্ডীয়মান পকিস্তানী পতাকাটি নামিয়ে বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করার উদ্দেশে পুরস্কার দেবার প্রলোভন দেখিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র বিভাস গমেজের হাতে ব্লেড ও ম্যাচ্ ধরিয়ে দেয়া হলো। তাকে বলে দেওয়া হয় পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে যেন, আগুনে পোড়ানো হয় এবং সে খুঁটিতেই যেন বিপ্লবী জয়বাংলার পতাকা উড়ানো হয়। বিভাস তার বন্ধু প্রদীপ কস্তার সহযোগিতায়, কাজটির শেষ পথে এসে প্রধান শিক্ষয়িত্রী সিস্টার এ্যান এসএমআরএ'র তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায়। এলাকা রক্ষার্থে সিস্টার এ্যান শিশুদ্বয়কে শাসন করতে বেত্রাঘাত করেন এবং এলাকার নিরাপত্তার বিষয়ে ভেবে তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদটি গোপন রাখেন। অতঃপর, তথ্যটি গ্রামে জানাজানি হয়ে গেলে, গ্রামবাসী শিশু দু'জনকে উৎসাহ দানে প্রশংসাই করেন।

বোরোধান কাটার মৌসুম। বেলাই বিলে জোয়ারের পানি বাড়ছে। এমএ পরীক্ষা শেষে নিজ গ্রামের বাড়ীতে আমাকে ধান মাড়াই করার কাজে জড়িয়ে পড়তে হলো। ১৪ মে, বেলা দু'টা নাগাদ বাইরা গ্রামে পাক-বাহিনী হামলা চালায়। হিন্দু প্রধান গ্রামটি বিলের ধারে থাকায় মৌসুমী চাষাবাদের পাশাপাশি এরা মাছ ধরার কাজ করে থাকেন। মাছ ও শুটকির ব্যবসা ছিলো ওদের জমজমাট বাণিজ্য। এক কথায় গ্রামটি ছিলো আর্থিকভাবে স্বচ্ছল এবং সম্পদশালী।

ধান কাটা, মাড়াই, সংগ্রহ ও গোলাজাত করনে সবাই ব্যস্ত। আচমকা আক্রমনে স্নানাহারে ব্যস্ত মা-বোনেরা অর্ধনগ্ন অবস্থায় বিল পাড় হয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম জয়রামবের, বক্তারপুর, রাঙ্গামাটিয়া, দেওলিয়ায় এসে তাৎক্ষণিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিশ-পঁচিশ জন লোক রাঙ্গামাটিয়া

গির্জা প্রাঙ্গনে এসে কান্নাকাটি করছিলেন। রৌদ্রতপ্ত দুপুরে খাবার পর রাঙ্গামাটিয়া কবরস্থানের পাশে, কয়েকটি গাব গাছের তলায় বেশ ছায়াঘন স্থানে গামছা বিছিয়ে আমি বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। নিরীহ মানুষগুলোর কান্না শুনে ওদের কাছে গিয়ে ওদের মারাত্মক দুর্দশার কথা নিজ কানেই শুনলাম। গির্জার পাল-পুরোহিত ফাদার চার্লস হাউজার সিএসসিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরজা খুলে ওদেরকে আশ্রয় দেবার অনুরোধ জানালে, তিনি তাৎক্ষনিকভাবে বিদ্যালয় কক্ষের চাবির গুচ্ছটি আমাকে ধরিয়ে দিলেন।

রাঙ্গামাটিয়া মিশন চত্বরে সাময়িক আশ্রয়স্থলের সংবাদ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে, বেশকিছু নিরীহ এবং ক্ষুধার্ত মানুষ এসে বিদ্যালয় কক্ষে আশ্রয় নেন। রাজনৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিষয় না ভেবে ফাদার হাউজারের আচরণ আমাকে সেদিন দারুণভাবে মুগ্ধ করেছিলো। প্রাথমিকভাবে শরণার্থীদের খাবার ব্যবস্থা করার উদ্দেশে প্রতিবেশি পরিবারের বিভিন্ন মা-বোনেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন। এদের সাহায্য করার উদ্দেশে কেউ দিলেন কাপড়, কেউবা দিলেন খাবার। গির্জার কাছে আমাদের বাড়ি থাকায়, অর্ধনগ্ন মা-বোনদের সেবায় আমার মা, বোন, জ্যাঠি মা, কাকী মা, পিসিমাসহ আগ্নেস দিদি (যেরুম কস্তার মা) ও সিস্টারগণ দ্রুতগতিতে এদের সেবায় এগিয়ে এলেন। রাতের খাবার জোগাড় করার উদ্দেশে ডেভিড স্বপন রোজারিও, শান্ত বেঞ্জামিন রোজারিও, পরিমল ডি' কস্তাকে সাথে নিয়ে রাঙ্গামাটিয়া ও জয়রামবের গ্রাম থেকে চাল, ডাল, মুড়ি, টাকা সংগ্রহ করে আমরা স্কুল প্রাঙ্গণে পৌঁছে দেখতে পেলাম, ফাদার হাউজারের ব্যবস্থায় প্রাপ্ত চাল-ডাল ও সবজির খিচুড়ী রান্না হচ্ছে। রান্নার কাজে ব্যস্ত কান্দু মন্ডল, বিপীন মন্ডল, মোহাম্মদ আলি (জয়দেবপুরে বঙ্গবন্ধু আমাকে নিয়ে কথা বলার সংবাদ যিনি আমাকে সর্বপ্রথমে জানিয়েছিলেন), নিকোলাস গমেজ, পিটার পঁচা রিবেরুকে একত্রে কাজ করতে দেখে আশ্চর্য হলাম। প্রায় ষাট জনকে খাবার পরিবেশন করার পর তারাই থালা, বাসন ধোয়ার দায়িত্বটুকুও পালন করলেন। পরের দিন ওদের সাথে যুক্ত হলেন পিয়ব রিবেরু, ডেঙ্গু গমেজ, পিটার রিবেরু (গায়ক)। একদিনের ব্যবধানে শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় তিনশত। পরের দিন সকালে ফাদার হাউজার আমাদের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে বাইরা গ্রামে প্রবেশ করেন। এলাকার সাহসী জনতা আমাদের কাছে এসে ৫৬ জন মৃত ব্যক্তির সন্ধান দেন। শতাধিক আহত ব্যক্তিকে তুলে আমরা রাঙ্গামাটিয়া কনভেন্টের চিকিৎসালয়ে সিস্টার সিসিলিয়া এসএমআরএ'র মাধ্যমে সেবার ব্যবস্থা করি। মৃতদের সৎকার ও আহতদের সেবার যে ঐশ আনন্দ, এর স্বাদ ইতিপূর্বে কখনো আমার জানাই ছিলো না। আমাদের উদ্যোগ এবং জনগণের দানে প্রায় দু'দিন খাবার ব্যবস্থা করার পর, ফাদার হাউজার ঢাকা থেকে সাহায্য নিয়ে এসে নিরীহ আশ্রয় প্রার্থীদের খাবার পরিবেশন করার ব্যবস্থা করেছেন। শরণার্থী শিবির পরিচালনার দায়িত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাকেই পালন করতে হয়েছিলো বটে! পরে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক দল বেশ বড় আকারে পরিণত হয়েছিলো। জাতীয় কাবাডি দলের খেলোয়াড়, বিমান বাহিনীতে কর্মরত ক্লেমেন্ট কস্তা (ভূঞা) আর্তের সেবায় এগিয়ে আসলে, আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের পরিচালনা করার কাজটি বেশ সহজ হয়।

ওদিকে নাগরী গির্জার পালক ফাদার গেডার্ড প্রায় দশ হাজার সর্বহারা মানুষের সেবায় আরেকটি শরণার্থী শিবির পরিচালনা করছেন জেনেও নিজেদের শিবির পরিচালনার কাজে জড়িয়ে পড়ায় কোথাও যাওয়া এবং সেটি দেখার মতো সুযোগ আমার হয়ে উঠেনি। এক সপ্তাহের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থীদের সংখ্যা পাঁচশত ছেড়ে গেলো। সমবেদনা জানাতে রাঙ্গামাটিয়ায় আসা দুর্দশাগ্রস্থদের চেনা-অচেনা আগন্তুকের আগমন যেন এক মিলন মেলায় রূপান্তরিত হলো। তহবিলের ভার ফাদার হাউজারের হাতে রাখা হয়। স্বেচ্ছাসেবীগণ পালাক্রমে রান্না বাড়ার কাজ, থালাবাসন ধোয়ার কাজ, আহতদের সেবা, মৃতের সৎকার করা এবং লাঠিসোটা ও বর্ষা হাতে শত্রু সামাল দেবার জন্য আমরা চব্বিশ ঘন্টা ব্যাপী কর্মরত একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছিলাম। শত্রুর আগমন বার্তা জানার উদ্দেশে রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টা আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী ছিলো জাগ্রত। ক্লেমেন্ট ডি' কস্তা (ভূঞা) কে স্বেচ্ছাবাহিনী প্রধান করে গোটা ধর্মপল্লীর যুব সমাজ দায়িত্ব পালন করছিলেন। চিকিৎসা সেবায় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সুবাস দেউরি, মুকুন্দ চক্রবর্তী, তার ভাই কুমুদ চক্রবর্তী এদের ভাগ্নে অনিল চক্রবর্তী ছাড়া সিস্টার সিসিলিয়া এসএমআরএ তার সহযোগী সিস্টার ও মেয়েরাই ডাক্তারের দায়িত্ব পালন করে জাতীয় দুর্যোগের সময় চিকিৎসা সেবার কাজে রাঙ্গামাটিয়ার পক্ষে মহান ও গুরুত্বপূর্ণ এ দায়িত্ব পালন করেছেন।

পাহারাদারদের অনুমতি বিনে কোন আগন্তুককে রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে প্রবেশ করতে দেয়া হতো না। মাঝেমধ্যেই পাক-সেনাদের ভূয়া আগমন বার্তায়, দুঃখী মানুষের কোলাহল ও দৌড়াদৌড়িতে এলাকাটি হয়ে উঠেছিলো এক চাঞ্চল্যকর ও আতঙ্কের কারণ। এক রবিবারে হঠাৎ মানুষের ছুটাছুটি ও আর্তনাদ শুনে, খ্রিস্টযাগ থামিয়ে ফাদার হাউজার আমাকে সাথে নিয়ে পূর্বদিকে দ্রুতগতিতে হেঁটে চলছেন। পিছনে রয়েছে সব খ্রিস্টভক্তদের এক মহা শোভাযাত্রা। যুবকদের জন্য অনুষ্ঠিত তৃতীয় খ্রিস্টযাগ চলছিলো। মহিম চন্দ্র মন্ডল (মহিমা) ছিলেন গোটা এলাকার একজন ধন্যাঢ্য ব্যক্তি। কতিপয় লোভী ব্যক্তি তার বাড়ী লুট করার প্রস্তুতির মুহূর্তে পাক-বাহিনীর ভূয়া আগমন সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে, আতঙ্কিত গ্রামবাসীদের ছুটাছুটিতে নিকটবর্তী এলাকায় পাঞ্জাবী সেনাবাহিনী আসছে এমনটি প্রচার হয়। ঘটনার মূল কারনে বশির বাড়ীর মুরুব্বীরা বখাটে যুবনেতাকে ধরে, মারধর করছিলেন আর চতুর্দিকে হৈচৈ চলছিলো। মার্কিন যাজক ফাদার হাউজারের সাথে আমাকে দেখে জনতার কোলাহল থেমে যায়। আহত যুবক আমাকে দেখে তাকে রক্ষা করার ইঙ্গিত করলে, আঘাত করা থেমে যায় এবং মৃতপ্রায় যুবকটিকে বাড়ীর উত্তরে শুকনো খালে ফেলে রেখে সবাই চলে যান। অতঃপর, ওর মা-বাবা এসে যুবকটিকে অন্যত্র নিয়ে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন। এ ঘটনার দু'একদিন পরেই কয়েকজন পাক-সেনা এসে মাঠে কর্মরত লোকদের জিজ্ঞেস করে, "চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু কো মোকাম কি ধার হ্যায়?" আমাকে বাঁচাতে ওরা পাকিস্তানীদের দক্ষিণ-পশ্চিমে ভুল পথে যাবার নির্দেশ দিলেন। কিছু দূর এগিয়ে পাঞ্জাবিরা আমার নাম উচ্চারণ করলে, ওরা কেউ আমাকে চিনেন না বলায়, ওরা ভীষণ ক্ষেপে যায়। পরের দিন আবারও ওরা বান্দাখোলা এসে যাকে সামনে পেয়েছে, তাকেই মারধর করে চলে গেছে। মার খাওয়াদের একজন এসে, ফাদার হাউজারকে বিষয়টি জানিয়ে চলে গেলে, ফাদার আমাকে জরুরীভাবে ডাকালেন। সাক্ষাতে ফাদার আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে দেশত্যাগ করার পরামর্শ দেন। গ্রাম বাঁচানোর স্বার্থে ১৪ই জুন, সকালে ডেভিড স্বপন রোজারিও এবং ডানিয়েল ডি' কস্তাকে সাথে নিয়ে ভারতের উদ্দেশে রাঙ্গামাটিয়া ত্যাগ করি।

আড়িখোলা থেকে রেল গাড়ীতে চড়ে রায়পুরা রওনা হলাম। অশ্বিনী ফ্রান্সিস কস্তা এবং সুবল ডি' কস্তা আমাদের তিনজনকে আড়িখোলা

পৌঁছে দিয়ে চোখের জলে ওরা দু'জন আমাদের বিদায় দিলো। আমাদের কামরায় দু'জন প্যারা মিলিটারি উঠলো। সাথে রেখেছি ফাদার যেরুম প্রদত্ত পত্র। আমরা ক্যাটেখ্রিস্টের কাজে সুনামগঞ্জের মুগাই পাড় গির্জায় যাচ্ছি এমনটি লেখা চিঠি, একটি মোমবাতি ও পবিত্র বাইবেল সাথে থাকায় ভয় পাইনি। নরসিংদী গাড়ী থামতেই প্রায় সব মানুষ নেমে গেলো। আমাদের কামড়ায় শুধু তিনজনই রয়ে গেলাম। মিলিটারীদের চলাফেরা দেখে আমরা মোমবাতি জ্বালিয়ে বাইবেল পড়ছি। মিলিটারিরা উঠে বেশকয়েকবারই আমাদের প্রার্থনারত দেখে, "ইসাই" বলে নেমে গেলো। পরের ষ্টেশনেই আমরা নামবো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে নরসিংদী পার হলাম। রায়পুরায় দীনেশ সাহার বাড়ীতে পৌঁছার জন্য রিকশা নিলাম। ধনী লোকের বাড়ী, ঘরে ডুকে অপেক্ষমান আরো অনেক হিন্দু শরণার্থীদের দেখা পেলাম। ডাল-ভাত খেয়ে সন্ধ্যা অবদি চুপ করেই ঘরের অভ্যন্তরে আমরা বসে রইলাম। সন্ধ্যায় বিশাল আকারের খোলা একটি সিলেটি নৌকায় চড়ে ষাটজনের মত পুরুষ-মহিলা-শিশুদের নিয়ে সীমান্ত এলাকার সিএন্ডবি রোড পার হবার উদ্দেশে রওনা হলাম। অজানা-অচেনা জনশূণ্য বিভিন্ন গ্রাম, বিশাল এলাকাজুড়ে আবাদি ধানক্ষেত। কখনো বা পাটক্ষেত পাড়ি দিয়ে জল-কাঁদাপূর্ণ রাস্তায় হেঁটে পরিত্যক্ত এক বিশাল বাড়ীতে উঠে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর, যাত্রীদেরকে শুকনো চিড়া গুড় এবং শুকনো কিছু খাবার পরিবেশন করা হলো। দালালরা নানা গল্প শুনিয়ে বারবার শত্রুর ভয় দেখিয়ে আমাদের সবাইকে একত্রে নিয়ে সিএন্ডবি রোড পার করলো। সীমান্ত এলাকার পরিত্যক্ত ঘরবাড়ীর ওপর দিয়ে আমরা কোথায় যাচ্ছি কিছুই জানা নেই।

ভোর হতেই দু'চার জন এলাকাবাসীকে হয়তোবা নিজস্ব জমিতে কাজের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করতে দেখা গেলো। বর্ষার শুরুতে অনেক জমিতে জল ভরা রয়েছে। কয়েকটি খোলা নৌকা ভাড়ায় যাবে এমন অবস্থায় অপেক্ষা করছে। পথ-প্রদর্শক দালাল গোষ্ঠির কেউ বলছেন, "আর ভয় নেই। ত্রিপুরা এসে গেছেন।" মাতৃভূমির পবিত্র মাটি কপালে ঠেকিয়ে নৌকায় উঠে বসার পর আধাঘন্টার মতো জলপথের যাত্রা শেষে আমাদেরকে একটি বাজারে নামিয়ে দেয়া হলো। বাস কিংবা টেম্পুতে চড়ে সেখান থেকে আমাদেরকে যেতে হবে আগরতলা রাজবাড়ী। যথাসময়ে আগরতলায় পৌঁছে নিজ এলাকার কিছু পরিচিত হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের সাথে দেখা হলো। ওরাই আমাদেরকে জয়বাংলার কার্যালয় এবং ভারতীয় থানায় নাম নিবন্ধন করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন।

প্রাথমিক কার্যাদি শেষে আমরা থাকার জায়গা খুঁজছিলাম। কাটেখ্রিস্ট মাষ্টার সিসিল রিবেরু মরিয়মনগর ধর্মপল্লীতে প্রচারকের কাজ করেছেন। যাবার আগেই বাবা বলে দিলেন, মিশনে গিয়ে জ্যাঠামশাইর পরিচয় দিলে আমাদের থাকার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সন্ধ্যায় গির্জায় পৌঁছে কানাডার ফাদার জর্জ লেকলিয়ার সিএসসির সাথে পরিচয় করে নেবার পর তিনি সবার জন্য ডাল-ভাজি ও ভাতের ব্যবস্থা করলেন। মরিয়মনগর গির্জায় অবস্থান নেয়া নাগরীর সুনীল ডি' ক্রুজ সহ বেশ কয়েকজন যুবকের সাক্ষাতে প্রথমেই এলাকাটি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিলাম। রাতে স্কুল ঘরের ব্যাঞ্চগুলো আমাদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হলো। ১৬ জুন আগরতলা শহরে পৌঁছার পরের দিন, বান্দাখোলা-রাঙ্গামাটিয়া-দেওলিয়া জয়রামবের এলাকার প্রায় পঁচিশ জন যুবককে শহরে একত্রে দলবদ্ধ হয়ে হাঁটতে দেখা গেলো। ওদের দেখে আমি থেমে ওদের সাথে কথা বলে পরামর্শ দিলাম, সন্ধ্যায় ওরা মিশনে গিয়ে যেন ফাদারের সাথে দেখা করে এবং থাকার জায়গা চায়। যে কথা সেকাজ। একসাথে এতোগুলো যুবকের সমাগমে ফাদার জর্জ আমাকে ডেকে, ওদের চিনি কিনা জানতে চাইলেন। এরা সবাই আমার পরিচিত বলতেই বাবুর্চিকে ডাল-ভাত রান্নার কথা বলায় ফাদারের বাবুর্চি জন লাগার্দু তার কাজ বেড়ে যাওয়ায় আমার উপর অসন্তুষ্ট হলেন। ভাবসাব দেখে দ্বিতীয় দিন থেকে ১৭ জুন, আমরা নিজেরাই পেট পুজা দিতে পালাক্রমে রান্নার কাজ চালিয়ে গেলাম। ছাত্র নেতাদের মাঝে প্রথমদিন আমাদের অবস্থা জানার জন্য মরিয়ম নগর গির্জায় চলে এলেন আ.স.ম আবদুর রব ও স্বপন কুমার চৌধুরী। এভাবে কখনো শাজাহান সিরাজ, কখনো শেখ ফজলুল হক মনি ভাইয়ের যাতায়াতে কাশিনাথ পুর এলাকায় সবার কাছে আমার পরিচিতি বেড়ে যায়। ফাদার জর্জ আমাকে মাস্তান ভাই বলে একদিন সম্বোধন করেন। আমি মনে মনে অসন্তুষ্ট হই বটে! ফাদারকে জানালাম আমাদের ভাষায় মাস্তান বলতে সন্ত্রাসীকে বুঝানো হয়। তিনি বললেন, "ধর্মস্থানগুলোর নিয়ন্ত্রককে এদেশে সম্মানপূর্বক মাস্তান বলা হয়।" পরে তিনি আমাকে চিত্তবাবু, কখনো লিডার বলে সম্ভোধন করেছেন।

মুক্তিযোদ্ধাকে এফএফ বা ফ্রিডম ফাইটার বলা হতো। রাজনৈতিক কারণে বিএলএফ নামে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সকে মুজিব বাহিনী নামকরণ করা হয়। আগরতলার বাইরে অরুন্ধতি নগর। তার পাশে বেলতলিতে ঢাকা জেলার বিএলএফ ঘাটিতে প্রধান ছিলেন বুরহান উদ্দিন গগন। তার সহকর্মী হিসেবে মফিজুর রহমান, কাজী মোজাম্মেল হক ও চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরুকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। অরাজনৈতিক সম্প্রদায় নামে পরিচিত খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ে কোন রাজনীতিক ছিলেন না বিধায়, মনি ভাই ও রব ভাই আমাকে দায়িত্ব প্রদান করেন যেন বঙ্গবন্ধু সমর্থক ছাত্র-যুব-সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে মুজিব বাহিনীতে, খ্রিস্টান সম্প্রদায় থেকে অধিক সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগ করার দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করি। এ সুবাদে আমার গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে মনি ভাই ব্যতীত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন আমার অবস্থানগুলো কেবল রব ভাই ও স্বপন চৌধুরীই জানতেন।

আমার মাধ্যমে সর্বপ্রথম চারজনকে মুজিব বাহিনীতে যাবার উদ্দেশে বাছাই করা হলো, যথাক্রমে:- পেট্রিক কীরণ রোজারিও, সুনীল ইগ্নেসিউস কস্তা, সুনীল ডি' ক্রুজ ও ডানিয়েল ডি' কস্তাকে। এভাবেই নিয়োগ তালিকায় সংখ্যা বেড়ে অতঃপর, শান্ত বেঞ্জামিন রোজারিও, হিউবার্ট সন্তোষ ডি' কস্তা, মোমতাজ উদ্দিন খান, নরোত্তম বণিক, ডেভিড হেনরী মজুমদার, প্রতাপ ডি' ক্রুশ, এলবার্ট পি কস্তা, এডুয়ার্ড কর্ণেলিউস গমেজ, নিকোলাস গনছালভেজ, আন্তনি পিউরিফিকেশন, অতুল ডি' কস্তা, ছিপ্রিয়ান রিবেরু সহ আমার মনোনীত প্রায় চল্লিশ জনকে বিভিন্ন দূর্গ থেকে স্বশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। এফএফ এর মধ্যেও অনেকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালিন অজানা এ দায়িত্ব পালন করার মধ্যদিয়ে, আমাকে বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ পরিস্থিতি পরিদর্শন করার সুযোগও দেয়া হয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের কার হাতে কি অস্ত্র প্রদান করা হয়েছে, তার তালিকা আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়েছে। ঢাকা জেলাধীন পাকিস্তান সমর্থকদের কাকে কোথায় আঘাত করা হবে এবং কাকে শেষ করা হয়েছে, সেটিও আমার জানা থাকতো। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে যুবকদের বাছাই করার ফাঁকে আমাকেও

অস্ত্র চালনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য মাঝে মাঝে আমার হাতে একটি রিভালভার দেয়া হতো। হাতে অস্ত্র থাকলে, আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া হতো। ফলে, ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যানুসারে "যে অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, সে অস্ত্রেই তার মৃত্যু হয়।" এমন ধারণাকে গুরুত্ব দেবার ফলে নানা শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের মধ্যেও অদ্যাবধি নিরাপদ জীবন-যাপন করে এসেছি। স্বনামধন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক সাহেবের উৎসাহে, আমার অভিমান ভাঙ্গার পর, ধৈর্যের কারণেই বর্তমানে যাচাই, বাছাই ও ছাটাই তালিকায় আমার নাম উঠেছে এবং মুক্তিযোদ্ধার গর্বিত সম্মানি ভাতা উপভোগ করার সুযোগ লাভ করেছি।

রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের যাতায়াত ব্যবস্থা ছিলো অত্যন্ত খারাপ, কষ্টকর ও প্রতিকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও বীর মুক্তিযোদ্ধারা, আশেপাশের পাঞ্জাবীদের ঘাটিতে বারবার আঘাত করা অব্যাহত রেখেছেন। রাস্তা-ঘাট নেই বিধায় গ্রামের অভ্যন্তরে কান্দির বাড়ীতে মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা-খাওয়া এবং অস্ত্র রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। আগরতলার সাথে সম্পর্ক রক্ষার জন্য মাথিয়াছ রিবেরু এবং ফেরু ফ্রান্সিস কস্তার পরামর্শক্রমে, মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকা জেলা নিয়ন্ত্রকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হতো। অনিল ডি' কস্তা (শহীদ) মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা-খাওয়ার সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বাড়তি দায়িত্ব পালনে এডুয়ার্ড গমেজ (বগী), পেট্রিক গমেজ (মেনি) নৌকাযোগে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রাম-গ্রামান্তরে পাড়ি জমাবার দায়িত্বে ছিলেন।

ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা, কেবল মাত্র রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতেই ছিলো ৬৬ জন। নাগরী-রূপগঞ্জ ইউনিয়নের অন্তর্গত মঠবাড়ীর দক্ষিণাঞ্চলে, ধাম্চির গড় (পূর্বাচল শহর) হিন্দু প্রধান গ্রাম গুলোতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান বাড়ীতে মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন আস্তানা গড়ে উঠেছিলো। এলাকার গভীর বন-জঙ্গলে সাহসী যুবকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠায়, কাঞ্চন ব্রীজ এবং পাঁচদোনা এলাকায় পাক বাহিনীর সাথে প্রায়ই সম্মুখ যুদ্ধ বেধেছে এবং পাঞ্জাবী শত্রুদের পাশাপাশি অনেক মুক্তিযোদ্ধার জীবনাবসান ঘটেছে। বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধে এলাকার অনেক খ্রিস্টান যুবকরাও সক্রিয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আলেকজান্ডার সমর ডি' কস্তা, সন্তোষ রড্রিক্স গেরিলাযুদ্ধে একাধিকবার বীরত্বের সাথে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে পরিমল ডি' কস্তা, আগষ্টিন পেরেরা (শহীদ), বাবলু পেরেরা (শহীদ), আন্তনী পিউরিফিকেশন (শহীদ), ক্লেমেন্ট কস্তা ভূঞা, মন্টু ডি' কস্তা, ডেভিড ডি' রোজারিও বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

অপরদিকে যুদ্ধের শেষাংশে এসে জয়দেবপুর এলাকার বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধে লুইস সন্তোষ গমেজ, প্যাট্রিক কীরণ রোজারিও, ডানিয়েল ডি' কস্তা, ইগ্নেসিউস এস. গমেজ, সুব্রত বনিফেস গমেজ, শান্ত বেঞ্জাবিন রোজারিও, সুনীল ইগ্নেসিউস ডি' কস্তা, সুনীল ডি' ক্রুজ, পাঞ্জোরার বাদল ডি' কস্তা, রাঙ্গামাটিয়ার সিপ্রিয়ান রিবেরু প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের গৌরবময় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত বহু তরুণ যুব বীর মুক্তিযোদ্ধাকে যুদ্ধ চলাকালে শত্রুর ফাঁদে পড়াদের প্রায় সবার গলায় ক্রুশ ও সাথে রোজারি মালা (তজবী) পাওয়া যাওয়ায়, পাক-বাহিনীর ক্রোধ খ্রিস্টান সমাজের উপর দারুণভাবে বেড়ে যায়। ফলে রাঙ্গামাটিয়ার কথিত আস্তানায় আক্রমণ করার সুযোগের অপেক্ষাই করা হচ্ছিল মাত্র।

সংঘবদ্ধ, শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বৃহত্তর ঢাকা জেলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিএলএফ এবং এফ.এফ বাহিনীর যৌথ আঘাত ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে থাকে। ২৫ নভেম্বর, দড়িপাড়া রেল সড়কের ব্রীজ কেটে আলাদা করার উদ্দেশ্যে হাজারো জনতা কোঁদাল নিয়ে কাজে লেগে যাবার পর, হঠাৎ ঢাকার ট্রেন এসে পড়লে হাজারো জনতার দিশেহারা ছুটাছুটি আরম্ভ হয়। সেনাবাহিনীর এলোপাথারি গুলিতে সেদিন কয়েকজন আহত হন। পরের দিন ২৬ নভেম্বর, পূর্বদিনের ঘটনার সময় ধরে, কালিগঞ্জ থেকে একদল এবং পশ্চিম দিক থেকে আরেক দল পাকসেনা, দড়িপাড়া-বান্দাখোলা হয়ে রাঙ্গামাটিয়াভিমুখে প্রবেশ করে।

পূবাইল থেকে আগত ট্রেনে অবস্থান নেয়া পাক-বাহিনী, কামানের গুলিতে রাঙ্গামাটিয়ার জনতাকে আতঙ্কে নিক্ষেপ করে। প্রশিক্ষণপাপ্ত মুক্তিবাহিনীর হালকা অস্ত্রধারী মাত্র ২৬-২৮ জন মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিব বাহিনীর সদস্যগণ পাল্টা গুলি নিক্ষেপ করলে, বিক্ষুব্ধ পাক-বাহিনীর পক্ষে পাক বিমান বাহিনীও রাঙ্গামাটিয়ায় মেশিনগান চালায়। মার্তুস মাত্বরের (চিত্ত ফ্রান্সিসের পিতা) বাড়ীতে এলো পাথারি গুলি চালিয়ে এরা প্রতিটি ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মুক্তিবাহিনীর নির্দেশে গ্রামবাসীরা পালাতে চেষ্টা করেও সেদিনের যুদ্ধে মোট ১৪ জন আহত এবং ১৭ জন নিহত হন। খালপাড় হয়ে ওপারে গিয়ে, যারা সাতানীপাড়ায় কচুরিপানার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, এদের ডেকে উপরে তুলে এনে সবাইকে একত্রে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে অনিল ডি' কস্তা, জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করেন। প্রাণে বেঁচে যাওয়া নিকোলাস গমেজ, নন্দী ডি' কস্তা ও সুনীল রিবেরু জীবিতাবস্থায় তা বর্ণনা করে গেছেন।

সেদিনের ঐতিহাসিক যুদ্ধে, রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের ১৩৭টি বাড়ী অগ্নিদগ্ধ হয়ে ভস্মিভূত হয়। ১৭ জন নিহত এবং ১৪ জন আহত হয়েছেন। মার্কিন যাজক ফাদার চার্লস হাউজার সি.এস.সি বিবিসিতে এ গ্রামের সংবাদটি জানিয়েছিলেন। তার উদ্যোগে রিবেরু বাড়ীর পোড়া ঘরের চিত্র, পাশ্চাত্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে বটে! মণ্ডলী কর্তৃপক্ষ এর কোন তথ্য সংরক্ষণ করেননি বিধায় এ গ্রামের গৌরবোজ্জল যুদ্ধের ইতিহাস দ্বিতীয় বারের জন্য কখনো আলোর মুখ দেখেনি। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর অবহেলায়, বর্তমান প্রজন্ম নানাভাবে রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত হয়েছেন, প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেরই নাম সরকারী তালিকাভুক্ত হয়নি।

রাজনৈতিক দূরদর্শীতার অভাবে, যোদ্ধাহত খ্রিস্টমণ্ডলী জনকল্যাণের উদ্দেশে কেবলমাত্র ত্রাণ বিতরণ ও পূণর্বাসন প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত থ াকার কারণে, মুক্তিযুদ্ধে স্বদেশী খ্রিস্টভক্তদের গৌরবময় ইতিহাস ও মহান এ অবদানের কথা লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব থেকে অবহেলায় হারিয়ে যায়। খ্রিস্টানদের নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমগুলো রাজনীতি বিমুখ অপক্ক রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করায়, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করা এবং দেশী খ্রিস্টীয় সমাজের গর্বের সকল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমাদেরকে চিরদিনের জন্য হারাতে হয়েছে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে যাবার পরেও আগামী প্রজন্মের উদ্দেশ্যে লেখা, আমার এ অসম্পূর্ণ তথ্যধন্য নগন্য এ সামান্য ইতিহাসটুকুই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে দেশীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক অবদান সম্পর্কে, যুগ যুগ ধরে সাক্ষ্য দান করে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস॥

খোলা জানালা

মহান মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তি
মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠী

মিথুশিলাক মুরমু

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, এরপর থেকেই দেশের মানুষ স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র দু'দিন পরেই উত্তরবঙ্গের শহর রংপুরে পাক বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছিল বাঙালি হিন্দু-মুসলমান, আদিবাসী সাঁওতাল-উরাঁওসহ হাজার হাজার মানুষ। ২৮ মার্চ রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাওয়ে আদিবাসীরা লাঠিসোটা, তীর-ধনুক, বর্শা-বল্লম, টাঙ্গি নিয়ে অগ্রগামী হয়েছিলেন, সঙ্গে আরো ছিলো দেশপ্রেমের উল্লসিত চেতনা। সেদিন বলদিপুকুর, লোহানীপাড়া, বকরাম, শেখপাড়া ইত্যাদি গ্রামগুলো থেকে শুধু পুরুষেরা নন, আদিবাসী মহিলারাও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। নারীর সাহসে সাহসিত হয়েই পুরুষেরা পাকিস্তানী বাহিনীকে মোকাবেলা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। এ নারীদের অমিত সাহসের প্রশংসা কেউ-ই করেনি।

২. রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার সাঁওতাল আদাড়পাড়া গ্রামের কয়েকটি পরিবার যুদ্ধের সময় গ্রামেই থেকে যায়। এই পরিবারগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলো সোনামনি সরেন, মালতী টুডু ও সোহাগিনীদের পরিবার। অনুমান করা হয় প্রথম সাঁওতাল পরিবার হিসেবে সোনামনিদের পরিবারেই মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, সেবাসহ সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছে। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে অ-আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাসহ আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধার ১৫/২০ জনের একটি দল সাঁওতাল আদাড়পাড়াতে আশ্রয় নেয়। তাদের মধ্যে স্বপন, বাচ্চু, নাজমুল, জামিন সরেন, ক্ষুদিরাম মুরমু, সুশীল সরেন, সনাতন মুরমু, কার্তিক হাঁসদা, বিশ্বনাথ টুডু, চাম্পাই সরেন, সুধীরচন্দ্র মাজহী, লুকাশ সরেন, শুকলাল মুরমু নাম উল্লেখযোগ্য। সেদিন সত্তর/পঁচাত্তর বয়স্ক সোনামনি সরেন সেই ভয়াল দিনগুলোর কথা মনে করতেই বিমর্ষ হয়ে যান। তিনি জানান, তাদের বাড়িতে ৬/৭ জন মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান করতো। সোনামনি নিজ হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার দিয়েছেন, অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন, নিজেদের শোবার ঘর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের দল প্রায় আড়াই থেকে তিন মাস আদাড়পাড়াতে ছিলো। স্বাধীন হবার বেশ কয়েকদিন পূর্বে এলাকার রাজাকার যোবদ-এর প্ররোচনায় একদল পাকিস্তানী বাহিনী আমাদের বাড়িতে তল্লাশি চালায়ে তছনছ করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ করে। ভাগ্যিস একজন লোক সেদিন দৌড়ে এসে খবর দিয়েছিলেন বলে মুক্তিযোদ্ধাদের রাখা কয়েকটি অস্ত্র আমরা পুকুরের পানিতে ফেলে দিই, ফলশ্রুতিতে তল্লাশি করেও কোনো অস্ত্র পায় নাই। সেই সময়ের ষোড়ষী যুবতী মালতী টুডু। বাগরাই টুডুর ৭ ছেলেমেয়েদের মধ্যে মালতী ছিলো সবচেয়ে বড়। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিগুলো তাকে আজো কাঁদায়। তাদের বাড়িতেও আশ্রয় নেয় কয়েকজন আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা। বাড়ির বড় মেয়ে হিসেবে মালতীই তাদের খাবার, অস্ত্র লুকানো এবং আহতদের সেবা দিয়ে সুস্থ করেছেন।

৩. আদিবাসী সাঁওতাল নারী হীরামনি টুডু 'হীরামনি সাঁওতাল' হিসেবেই এলাকায় পরিচিত ছিলেন। '৭১-এ পাক বাহিনী দ্বারা উপর্যুপরি ধর্ষিত এবং চরমভাবে নির্যাতনের শিকার হন। নারী মুক্তিযোদ্ধা হীরামনি টুডু (৮৭) ৩ মার্চ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে বৃহস্পতিবার ভোরে মারা যান। এ দিনই তাকে হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার চান্দপুর চা বাগানের লোহাপুল এলাকায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন হীরামনি নির্যাতিত হলে শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন। জীবনের শেষান্তেও শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর আড়ালে ও অবহেলিত জীবন যাপন করেছেন। বিগত ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জের চেতনা একাত্তরের সদস্য সচিব আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী তাকেসহ হবিগঞ্জের ছয় নারী মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতির জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ৯ ডিসেম্বর এক প্রজ্ঞাপনে নির্যাতিত নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পান হীরামনি টুডু। মৃত্যুর পূর্বে স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন ও সম্মানিত হওয়ার সৌভাগ্য না জুটলেও মৃত্যুর পরবর্তী আত্মীয়-স্বজন, এলাকাবাসী এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনারা অবলোকন করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, জাতীয় পতাকা মোড়ানো হীরামনিকে। উপলব্ধি করেছেন, হীরামনি দেশ রক্ষার্থে সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন কিন্তু দেশ তার সম্ভ্রমের যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। একদা তিনি জানিয়েছিলেন, একাত্তরের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিকে হঠাৎ একদল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসর তাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। সদ্য বিবাহিত হীরামণিকে তখন পাকিস্তানী হানাদাররা জিজ্ঞেস করে তারা মুক্তিবাহিনী কি-না। তখন হীরামণি বলেন 'না', তিনি চা বাগানের শ্রমিক মাত্র। তার কথা শুনে পাকিস্তানি সেনারা দাঁত বের করে হাসতে থাকে। তারপর দুই সেনা ঘরের মধ্যে তাকে আটকে নির্যাতন করে, এরপর কতজন তাকে নির্যাতন করেছে তা বলতে পারেন না। নির্যাতনের পর যখন তার চেতনা ফেরে, তখন তিনি চানপুর ছোট হাসপাতালে ভর্তি। শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষতবিক্ষত। তার স্বামী তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন। এরপর হীরামণি সুস্থ হয়ে উঠলেও বেশ কিছুদিন পর মারা যান তার স্বামী লক্ষণ। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ১১ মে সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে হবিগঞ্জ জেলার (তৎকালীন মহকুমা) চুনারুঘাট থানার চাঁদপুর চা বাগান এলাকায় দেশবিরোধী অপারেশন পরিচালনাকালীন চা বাগানে হীরামনি টুডু নামের এক সাঁওতাল নারীকে ধর্ষণ করে সৈয়দ কায়সারের বাহিনী। পরবর্তীকালে সাঁওতাল নারী হীরামনি ক্যামেরা ট্রায়ালের মাধ্যমে কায়সারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, এই প্রথমবারের মতো ধর্ষণের দায়ে কোনো যুদ্ধাপরাধীকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল। কায়সারের বিরুদ্ধে দুই নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়েছিল। একজন সাঁওতাল নারী হীরামনি টুডু, অন্য নারী মাজেদা। এই দুই নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ দুটি প্রমাণিত হয়েছে। বিগত ২২ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন ৩ সদস্যের ট্রাইব্যুনাল

৪৮৪ পৃষ্ঠার এ রায় পড়ে শোনান। ট্রাইব্যুনালের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, 'মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচারে প্রণীত আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন '১৯৭৩-এ ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিধান না থাকায় ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দিতে পারছেন না। তাই রাষ্ট্রকেই নির্যাতিত বীরাঙ্গনা নারী ও যুদ্ধশিশুদের ক্ষতিপূরণ স্কিম চালু এবং তালিকা করে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা এবং এনজিওগুলোকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। ...১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধে যেসব নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তারা আমাদের দেশের জাতীয় বীর।' ট্রাইব্যুনাল বলেছেন, আজ আমাদের সময় এসেছে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়ার। মুক্তিযুদ্ধের চারদশক পর ধর্ষক ও দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মাননীয় ট্রাইব্যুনালের রায় শোনার পর হীরামনি উচ্চারণ করেছিলেন, 'আজ হামি বিচার পাইলাম, শেখের বেটি হাসিনাকে ধন্যবাদ, সরকারকে ধন্যবাদ। রায় তো হইছে, ফাঁছি দিতে হইবেক, হামি ফাঁছি দেখতে চাই।'

৪. ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের সম্ভ্রম হারিয়ে ও নির্যাতনের বিনিময়ে পেয়েছেন বীরাঙ্গনা স্বীকৃতি। এখন থেকে তারাও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন। দেশব্যাপী ৪১ জন বীরাঙ্গনার মধ্যে আদিবাসী সাঁওতাল নারী মনি কিস্কু অন্যতম। ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার রাউতনগর গ্রামের মঙ্গল কিস্কুর কন্যা মনি কিস্কু। '৭১-এ পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক বর্বরতম ঘটনার শিকার হয়েছেন। ২০০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে জেলার কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ওই গ্রামে সরেজমিনে বীরাঙ্গনাদের দেখতে যান এবং ৩৫ জন নারীকে সনাক্ত করেন যারা একাত্তরে পাকসেনাদের হাতে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। অনেক আদ্যোপান্ত বোঝানোর পর ২৪ জন নারী নাম পরিচয় দিতে রাজি হন, বেঁচে থাকা বীরাঙ্গনারা দীর্ঘদিন থেকেই দাবি করে আসছিলেন তাদেরকেও যেন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করার দাবি ছিল তাদের। অবশেষে মিলেছে স্বীকৃতি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় নাম ঘোষণা করেছে। বীরাঙ্গনা মনি কিস্কু বলেন, 'যুদ্ধের পর থেকে অনেক কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করছি। অর্থের অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পারি না। সরকার আমাকে মুক্তিযোদ্ধা ঘোষণা করায় আরও বেঁচে থাকার আশার আলো দেখছি। মরার আগে যেন মেয়ের বিয়ে দিতে পারি সেজন্য যত দ্রুত পারে যেন ভাতা প্রদান করে আমাকে'।

৫. শান্তিরাণী হাঁসদা বাবা সাগরাম মাজহী (হাঁসদা), মুক্তিযুদ্ধে সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। যুদ্ধকালীন পরিবারটি ভারতের লালগোলায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। শান্তিরাণী হাঁসদা লালগোলার মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে রান্নাবান্নার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ক্যাম্পের রান্নাবান্না তত্ত্বাবধান ও তদারকি করতেন। এভাবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন।

৬. শহীদ নাডা হেমরম, টুনু মার্ডি, ধেরিয়া, জটু সরেন, কানু হাঁসদা নাটোরের বাঁশবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধে তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিলো এবং অনেকেই সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তাদের সর্বোত্তম সহযোগিতার কথা পাকিস্তানী বাহিনীর দোসর আলবদর, রাজাকাররা জেনে গেলে হাজির হয় বাঁশবাড়িয়া গ্রামে। পাকিস্তানী সৈন্যরা নাডা হেমরমকে নিজ ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং অদূরে গুলি করে হত্যা করে। স্থানীয় রাঙামাটি মাঠে তুলে নিয়ে জবাই করে হত্যা করে মুক্তিযোদ্ধা টুনু মার্ডি, ধেরিয়া, জটু সরেন ও কানু হাঁসদাকে। তাদের কারোরই লাশের সন্ধান পাওয়া যায় নি। এর পরপরই প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীরা গ্রামটিকে জ্বালিয়ে দেয়, অসহায় আদিবাসী লোকজন দিকবিদিক পালিয়ে যায়।

৭. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর নওগাঁ সাপহার-এর সৎপুর, পাইকবান্দা, হলাকান্দরের ৩৫ জন আদিবাসীকে ব্রাশফায়ার করে মারা হয়। ৩৫ জনের মধ্যে ৩৩ জনই ছিলেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের। একমাত্র বেঁচে যাওয়া গুলু মুরমু ২৬ জনের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন– শহীদ মুন্সি টুডু, পিতা- মঙ্গল টুডু; শহীদ যোনা টুডু, পিতা- অদগ টুডু; শহীদ মাংগাত মাজহী সরেন, পিতা- জপলা সরেন; শহীদ বয়লা হাঁসদা; শহীদ বার্নার্ড সরেন, পিতা- লেদেম সরেন; শহীদ সুফল হেমরম, পিতা- যিতু হেমরম; শহীদ বুদু হেমরম, পিতা- বাকা হেমরম; শহীদ সরকার মুরমু, পিতা- সম মুরমু; শহীদ মিস্ত্রী সরেন; শহীদ সবান; শহীদ ধুদু মুরমু, পিতা বাগরেদ মুরমু; শহীদ রবিকান্ত বর্মন, পিতা- পানু বর্মন; শহীদ মাতলা মুরমু, পিতা- বড়হাল মুরমু; শহীদ কবিরাজ মুরমু, পিতা- মাতলা মুরমু; শহীদ মদন মুরমু, পিতা- মাতলা মুরমু; শহীদ ভূতু সরেন; শহীদ বুধরাই টুডু; শহীদ যাদু মুরমু; শহীদ হারা সরেন; শহীদ মশাই সরেন; শহীদ চুড়কা টুডু; শহীদ সুফল হেমরম; শহীদ পাত্রাস; শহীদ যোসেফ; শহীদ জেঠা হাঁসদা। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই আদিবাসী গ্রাম দুটি– পাইকবান্দা, হলাকান্দর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

৮. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় দিনাজপুরের সদর থানার খোসালপুর গ্রামের ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন। এলাকাবাসী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে পার্শ্ববর্তী ফারাম হাট নামক জায়গায়। সেদিন সম্মুখ যুদ্ধে অনেক লোক শহীদ হয়েছিলেন। খোসালপুর গ্রামের আদিবাসী সাঁওতাল-কর্মকারদের মধ্যে রয়েছেন- শহীদ সোকারী মার্ডী, পিতা মৃত. নদীয়া মার্ডি; শহীদ চুণ্ডা মার্ডী; শহীদ বোদে বাসকে, পিতা মৃত চান্দারাই বাসকে; শহীদ লালু মার্ডী, পিতা মৃত. মদন মার্ডী; শহীদ বিনোদ কর্মকার, পিতা মৃত. ভগিরত কর্মকার; শহীদ গনেন্দ্র কর্মকার, পিতা- জিতু কর্মকার। সম্মুখ সমর থেকে এ গ্রামের প্রাণে বেঁচে রক্ষা পেয়েছেন– মুক্তিযোদ্ধা শ্রী নরেশ মুরমু, পিতা মৃত. মঙ্গল মুরমু; মুক্তিযোদ্ধা শ্রী বাপই মুরমু, পিতা- কুমার মুরমু; মুক্তিযোদ্ধা শ্রী বাবু সরেন, পিতা- আশা সরেন; মুক্তিযোদ্ধা শ্রী চুড়কা মুরমু, পিতা- চপে মুরমু। এ দিন আদিবাসীদের মধ্যে আরো ছিলেন– মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রামবাবু হেমরম, পিতা- বড়কা হেমরম, গ্রাম- সৈয়দপুর; মুক্তিযোদ্ধা শ্রী লক্ষণ মাজহী, পিতা মৃত.- ডাইলা মাজহী, গ্রাম- সৈদয়পুর (তালপাড়া); মুক্তিযোদ্ধা শ্রী মাইকেল হেমরম, পিতা- বাড়কা হেমরম, গ্রাম- পাঁচবাড়ী এবং মুক্তিযোদ্ধা বেঞ্জামিন সরেন, পিতা- মৃত. কানাই সরেন, গ্রাম-জপেয়া। মহান মুক্তিযুদ্ধে অন্যান্য নারীদের পাশাপাশি আদিবাসী নারী মিসেস নিরলা কিস্কু, স্বামী-কুড়িয়া, গ্রাম- বেলবাড়ি, সদর, দিনাজপুর পাকিস্তানী কর্তৃক শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধ কোষ, দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ পৃষ্ঠাতেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে–'দিনাজপুরের কর্নেল মারাণ্ডী অস্ত্র জমাদানকালে অস্ত্রভাণ্ডার বিস্ফোরণ ঘটলে শহীদ হন।'

১০. জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে মহান মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শহীদ ৪ মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভাস্কর্য উন্মোচন করা হয়। বিগত ১৭ ডিসেম্বর, ২০১১ জয়পুরহাট জেলার জেলা প্রশাসক অশোক কুমার বিশ্বাস আদিবাসীয় অস্ত্র হাতে নারী-পুরুষ ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করেন। এই চারজনই (শহীদ খোকা হেমরম, পিতা- লক্ষণ হেমরম; শহীদ মন্টু হেমরম, পিতা- লক্ষণ হেমরম; শহীদ যোহন সরেন, পিতা- কালু সরেন; শহীদ ফিলিপ সরেন, পিতা- লক্ষণ সরেন) ছিলেন আদিবাসী সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম নন্দইলের। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো' বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সেই ৭ মার্চের ভাষণের আহবানে সাড়া দিয়ে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিতে আদিবাসী নারী-পুরুষের প্রস্তুতির সেই চিত্রই ফুটে তোলা হয়েছে ভাস্কর্যটিতে। সরকারি ১৪ শতক জায়গায় ২১ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ভাস্কর্যটি ধরঞ্জী ইউনিয়নের নন্দইল মিশন গ্রামের পাশে নির্জন মাঠে স্থাপন করা হয়েছে। এটি নির্মাণ করা হয় ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সভাপতি প্রফেসর আমিরুল মোমেনিন চৌধুরীর নেতৃত্বে ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য বিভাগের তৎকালীন প্রভাষক কনক কুমার পাঠক ও সহযোগী অধ্যাপক ড. একেএম আরিফুল ইসলাম। তাদের সহযোগিতা করেন ওই বিভাগের ৮-১০ শিক্ষার্থী। আর সেই থেকে ভাস্কর্যটি স্বাধীনতা যুদ্ধে আদিবাসী সাঁওতালদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতীক হয়ে আছে।

১১. রাজশাহী গোদাগাড়ী থানার কাশিঘুটু (আমতলীপাড়া)র ১১ জন সাঁওতাল শহীদ হয়েছেন। স্থানীয় রাজ্জাক রাজাকারের প্ররোচনায় এপ্রিল মাসের দিকে হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে যায় এবং গুলি করে হত্যা করে। এরা হলেন– মানিক টুডু (২৬), পিতা- মুটরু টুডু; বাবলু হেমব্রম (৪০), পিতা- রাম হেমব্রম; হোপনা সরেন (৫০), পিতা– রামসিং সরেন; মানিক সরেন (ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়তরত), পিতা– হোপনা সরেন; হারমু মুরমু (৭০), পিতা– খুনা মুরমু; মঙ্গলা মুরমু (দুই ভাই ছিলেন), পিতা– ঠোয়া মুরমু; মুটরু টুডু, পিতা– ছুতার টুডু, কিষ্টু মুরমু, ধনাই মার্ডী, মঙ্গল মুরমু, পিতা– মারাং মুরমু এবং বুসতি।

১২. বাংলাবাহিনী দিনাজপুরে রণাঙ্গণে বড় রকমের সাফল্য অর্জন করেছেন। তারা গতকাল দিনাজপুর শহর থেকে পাক সাঁজোয়া বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছেন। বাংলা বাহিনীর এই আক্রমণে পাক বাহিনীর বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়। এ ছাড়া রংপুর শহরের বীরগঞ্জে বাংলা বাহিনীর হাতে পাক-বাহিনী পর্যুদস্ড় হয়েছে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ঢাকাতে পাক বিমান বাহিনী মুহুমুহু বোমাবর্ষণ করেছে এবং মেশিনগান থেকে গুলি চালিয়েছে। রংপুরের উপকণ্ঠে পাকফৌজ দুশ সাঁওতালকে হত্যা করেছে। তাদের ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে দিয়েছে'।

১৩. '১৮ সেপ্টেম্বর ই-পি আর কমাণ্ডার সালেক (বগুড়া), বেঙ্গল রেজিমেন্টের মান্নান, ঢাকা পুলিশের হাবিলদার রজব আলী এবং ছাত্র রঞ্জিত কুমার মহন্ত, প্রদীপ কুমার কর (গোবিন্দগঞ্জ) প্রভৃতির নেতৃত্বে হিলির পার্শ্ববর্তী স্থানে পাকবাহিনীর সহিত ভীষণ সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে পাকবাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হয়। ঘোড়াঘাটের ফিলিপস-এর (সাঁওতালী) নেতৃত্বে মাইন বিস্ফোরণে পাকসেনাদের একটি বেডফোর্ড মটর কার ভীষণভাবে ধ্বংস হয়'।

১৪. 'মিছিলকারীরা নাটোরের প্রতিটি সরকারি অফিস থেকে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করে। এদিন নাটোরের কৃষক, মজুর, জেলে, সাঁওতালসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ লাঠি, বর্শা, তীরধনুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতার পক্ষে এক জঙ্গি মিছিল বের করে'।

১৫. 'জয় বাংলা ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৪ এপ্রিল, ১৯৭১-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়, আমরা বীরের জাতি। পৃথিবীর বীর জাতিগুলির তালিকায় সর্বাগ্রে বাঙ্গালীদের নাম অবশ্যই থাকবে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে ট্যাঙ্ক, কামানের বিরুদ্ধে লাঠি, সাধারণ বন্দুক ইত্যাদি দ্বারা লড়াই করিয়া শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে তাহার তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। ... সাঁওতাল, গারো, হাজং, চাকমা, মগ ও অন্যান্য ভাইয়েরা আপনাদের বিষমাখা তীর-ধনুক লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়ুন। সৈন্যদলে বিভিন্ন উপশাখা থাকে। আপনারা বাংলার ধনুক বাহিনী হইবেন'।

১৬. সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক হিসেবে যার নাম উঠে আসে, তিনি হলেন সাগরাম মাজহী (হাঁসদা)। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট থেকে মেম্বার অফ লেজেসলেটিভ এসেম্বলী (এলএমএ) সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সখ্যতা গড়ে উঠেছিলো। জাতীয় চার নেতার অন্যতম কামরুজ্জামানের রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মীও ছিলো সাগরাম মাজহী। হাজার হাজার সাঁওতাল শরণার্থী হিসেবে আশ্রিত ক্যাম্পগুলোতে ঘুরে ঘুরে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেছেন দেশ মাতৃকার লড়ায়ে। অনেক মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি অকৃতিম ভালোবাসার কথা জানিয়েছে। তিনি সাঁওতালসহ আদিবাসীদের বুঝাতে পেরেছিলেন বলেই যুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো শতশত সাঁওতালসহ আদিবাসী যুবক।

১৭. ফাদার লুকাশ মারাণ্ডি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের খ্রিস্ট ধর্মীয় একজন যাজক। ...ভারতে পলায়নপর শরণার্থীদের রুহিয়া মিশনে আশ্রয় দিয়েছেন ও সহায়তা করেছেন। পাকসেনারা এই খবর পেয়ে ২১ এপ্রিল মিশনে গিয়ে ফাদার লুকাশকে হত্যা করে'।

১৮. মুক্তিযুদ্ধে মরণাস্ত্রের বিপরীতে আদিবাসীদের তীর ধনুকের সেই স্মারক স্মৃতিই বহন করে চলেছে 'অর্জন' ভাস্কর্যটি। তরুণ ভাস্কর্যশিল্পী অনীক রেজার সৃষ্টিকর্ম। এটিকে বলা হচ্ছে স্বাধীনতার স্মারক। '১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২৪ জুলাইয়ে ভাস্কর্যটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্যে তীর-ধনুক কেন, কৌতুহলী কোনো পথচারীর মনে এ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে, যদি কেউ রংপুরের বাইরে থেকে সেখানে গিয়ে থাকেন। কিংবা যার জন্ম একাত্তরের পরে, মুক্তিযুদ্ধের সময় কী ঘটেছিল রংপুর এলাকায়- এ সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল নন, তার মনেও এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। 'অর্জন' বিষয়ে রংপুরের জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় দেখা যাচ্ছে- সম্ভবত এটি শিল্পী অনীক রেজারই ব্যাখ্যা- স্তম্ভের মূল কাঠামোটি তীর-ধনুক কর্ম থেকে নেয়া। এই বাঁকানো কর্মটি এবং দণ্ডায়মান স্তম্ভ দুটি উপস্থাপন করবে তীর এবং ধনু, যা কিংবদন্তি তুল্য রংপুরের জনগণের তীর-ধনু নিয়ে সেনানিবাস আক্রমণ এবং শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা উপস্থাপন করবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ; দলিলপত্র নবম খণ্ড; পৃষ্ঠা- ৫৮২
. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ; দলিলপত্র দশম খণ্ড; পৃষ্ঠা- ৫১০
. ভোরের কাগজ ২৫ মার্চ, ২০০৪
. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ; দলিলপত্র ষষ্ঠ খণ্ড; পৃষ্ঠা- ৮৷৷

৭১ এর স্মৃতি থেকে...

হেলেন রোজারিও

৭১ এর সেপ্টেম্বরের এক সন্ধ্যায় আমার স্বামীকে পাক- বাহিনী ধ'রে নিয়ে গেলো। সেদিন বিকেলবেলা আমরা দু'জন আমি ও আমার স্বামী ও আমার কোলে আমাদের আট মাসের শিশুপুত্র এবং আমাদের বাড়ীওয়ালা বারান্দার সিঁড়িতে ব'সে চা খাচ্ছিলাম আর দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করছিলাম। হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ একটা জিপ গাড়ি গেটের ভিতর দিয়ে সরাসরি প্রবেশ ক'রে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। জিপ গাড়ীতে কয়েকজন বন্দুকধারী পাকিস্তানী মিলিটারী বসা। একজন নেমে এসে আমার স্বামীকে গাড়িতে উঠতে বললো। আমরা ভয়ে আর্ত-চিৎকার ক'রে উঠি। কেন? কি জন্য? কোনো কথাই শুনলো না। আমাদের বাড়িওয়ালা একটু বয়স্ক মানুষ, আমাদের যার পর নাই স্নেহ করতেন ও দেখাশুনা করতেন। আকস্মিক ঘটনায় আমি কান্নায় ভেঙ্গে পরলাম। উনিও লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে আমার স্বামীর পাশে ব'সে আমাকে বললেন, "বোন-কাঁদিস না, মরিতো দু'ভাই একসঙ্গে মরবো, আমরা আল্লাহ্'র ইচ্ছায় ফিরেও আসবো।" সেদিনের সেই ভয়ংকর স্মৃতি আজও মনে হ'লে গা শিউরে উঠে এবং কেঁপে উঠি। কেমন ছিল সেই সময়টা! সন্ধ্যা, ঘন অন্ধকার, বাড়ির অতি নিকটে রেল লাইন, জন-মানবহীন পাড়া। প্রতিবেশি যা-ও দু'এক ঘর, তারাও সন্ধ্যায় বের হয় না। তবুও আমার কান্না ও চিৎকারে পাড়ার দুইজন মহিলা এসে আমাকে ও আমার ছেলেকে জড়িয়ে ধ'রে রইলো। সবাই স্তব্ধ, বাকহীন। সেইসময়টা ছিলো ধরপাকড়ের সময়।

বাসা ও আমার ছোট্ট স্কুল ছিলো ২৮ মালিবাগে, রেল লাইনের একান্ত নিকটে। ঐ সময়টাতে ছেলেমেয়েদের সবাইকে গ্রামের বাড়িতে রেখে শুধু শিশুপুত্রকে নিয়ে আমরা দু'জন থাকতাম। সাথে আমাদের স্কুলের একজন শিক্ষক। ২৭ মার্চ আমরা যখন পায়ে হেঁটে দরজায় তালা দিয়ে গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলাম, তখন আমার নিচতলার তালা ভেঙ্গে বইপত্র, দরকারী কাগজ, বেতের টেবিল চেয়ার আগুন দিয়ে পুড়িয়ে রেখে যায় এবং চারটা ফ্যান ও পর্দাগুলো নিয়ে যায়। কে বা কারা করেছে এবং কে আগুন দিয়েছে জানা যায় নি। দরজা এমনি কোনো রকম বন্ধ ছিলো। আর শিক্ষক মহাশয় তখন দেবদূতের মতো এসে আমাদের বাসাটিকে রক্ষা করেন।

আবার যাই সেই ভয়ংকর ঘটনায়। আমার স্বামীকে তুলে নিয়ে যাবার পর আমরা আর ঘরে যাই নাই। বারান্দায়ই ব'সে ছিলাম। কোথা দিয়ে যে কেটে যাচ্ছে সময়! রাত প্রায় নটা। চারিদিকে ভূতুরে অন্ধকার। জনমানবহীন পথঘাট। হঠাৎ দেখি আমার স্বামী ও আমাদের বাড়িওয়ালা হেঁটে আসছে। বিধ্বস্ত চেহারা, ভীত মুখে কথা সরে না। তারা দু'জনেই এসে কেঁদে ফেললেন। বাড়ীওয়ালা ভাই বললেন, বোন আমরা মরি নাই। তেজগাঁও এর অদূরে কোথায় যেনো নামিয়ে দিয়ে গেছে। তখনকার দৃশ্য যে কীরকম ছিলো আজও ভুলতে পারি না, ভোলা যায় না। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে বসে থেকে ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ীওয়ালা ভাই চলে গেলেন। তার বাড়ি কলাবাগানে। মনে হলো এমন ত্যাগস্বীকার কে করতে পারবে? একজন অনাত্মীয় মানুষ কি ভাবে আমাদের জন্য এতবড় দয়ার কাজ করতে পারে! আজীবন তিনি স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। সবাই তখন বললো আমাদের কয়েকদিন এই ঘরে না থাকতে। তখন আমরা দুই রাত পাশের বাড়িতে রাত কাটিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে যাই।

স্কুল কলেজ খোলা রাখার নির্দেশে আমরা মে মাস হতে ঢাকায় থাকা শুরু করেছিলাম। ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত উপস্থিত থাকতো না। ভয়-আতংকে কেউই বের হতো না। তবুও খোলা রাখতে হতো। আমার এমএ পরীক্ষা শেষ হ'য়েছিল জানু- ফেব্রুয়ারিতে কিন্তু ভাইবা পরীক্ষার তারিখ ছিলো ৩ মার্চ, তখন উত্তপ্ত মার্চ মাস। ৩ মার্চ অসহযোগ আন্দোলন ঘোষিত হওয়ার পরই পরীক্ষা স্থগিত হ'য়ে যায়, সকল পরীক্ষাই স্থগিত হ'য়ে যায়। গ্রামের বাড়িতে ও শহরে আসা যাওয়ায় এক মরণাপন্ন অবস্থা বিরাজ করছিলো। চাকুরীর তাগিদে, কাজের তাগিদে মানুষ শহরে আসতো ঠিকই কিন্তু স্বস্তি-শান্তিতে নয়। ভয় আর আতঙ্ক ঘিরে থাকতো। আমার ছেলেমেয়েরা গ্রামের বাড়িতে থাকায় প্রতি সপ্তাহে আমাদের গ্রামে যেতে হতো। জুলাই-আগস্টে আমার স্থগিত পরীক্ষার তারিখ জানানো হলো। বইপত্রের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। কিভাবে পরীক্ষা দেবো? তবু দিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা তখন বিধ্বস্ত। লাশের স্তুপের ভারে বাতাস ভারি। চারিদিক থমথম। যেনো ভূতুরে নগরী। দাঁড়কাকের কর্কশ ডাক। রাস্তাঘাট জনমানব শূন্য। চলাচলের অভাবে ঢাকার রাস্তায় ঘাস গজিয়ে গেছে। শুধু পাক-সেনাদের বন্দুক হাতে, স্টেনগান হাতে পদচারণা। বিভৎস চাহনী। দেখলেই অন্তর-আত্মা কেঁপে উঠতো। ২৫ মার্চের ভয়াল রাতে শহরের উপর দিয়ে কত কি যে ঘটে গেছে, কত মৃত্যু, কত ধ্বংসলীলা চ'লে গেছে, তা বলা যায় না।

যথাসময়ে পরীক্ষা দিতে গেলাম। জনমানবহীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। শুধু পরীক্ষার্থীদের আনাগোনা। হলে ঢুকলাম। ব'সে আছেন সর্বশ্রদ্ধেয় মুনীর চৌধুরী, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, ড. আনোয়ার পাশা স্যার ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী স্যার। আজও এঁদেরকে চোখের সামনে সেই পোশাকে সেই অবস্থায় দেখতে পাই। চোখে জল ভরে আসে। মুনীর স্যার আমাদের 'কপাল কুন্ডলা' পড়াতেন। তাঁর সেই দরাজ কণ্ঠে **'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছো'** আজও ঐ কণ্ঠ আমার কানে বাজে। মোফাজ্জল হায়দার স্যারের রবীন্দ্র সাহিত্য, কত কি মনে পড়ে আজ। একদিন অনুপস্থিত থাকলে আমাদেরকে উঠে দাঁড়িয়ে কারণ দর্শাতে হতো। সবার সামনে বসে ভাইবা পরীক্ষা দিলাম। যে বিশ্ববিদ্যালয় ছন্দে, গানে, পাঠে, আনন্দে, ভাষণে সরগরম থাকতো, উদ্ভাসিত থাকতো, তারুণ্যের প্রাণচাঞ্চল্যে কোলাহলে মুগ্ধ থাকতো, ৭১ এর পাকবাহিনীর নির্মম নিষ্ঠুর গোলাবারুদের আঘাতে প্রাণহীন স্তব্ধ ক'রে দিয়ে গেছে। বুকে এক দলা কান্না চেপে প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন হ'তে বের হ'য়ে এলাম। ১৪ ডিসেম্বর দেশকে মেধাশুন্য করতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, সাংবাদিকসহ বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এঁদের মধ্যে বাংলা বিভাগের অত্যন্ত প্রিয় স্যার মুনীর চৌধুরী স্যার, ড. আনোয়ার পাশা স্যার, মোফাজ্জল চৌধুরী হায়দার চৌধুরী স্যারসহ আরো অনেককেই হত্যা করা হয়। দেশে আল-বদর, আল শামস রাজাকার, পাকবাহিনী সম্মিলীত হয়েই দেশের বুদ্ধিজীবী, দেশের অহংকার ও জ্ঞানের আলোকে নির্মূলভাবে নির্বাপিত ক'রে দেয়। জাতির সম্মান, অহংকার, শহীদ ছাত্র জনতা, বুদ্ধিজীবীদের তাজা রক্তে রঞ্জিত এই বাংলাদেশ ও শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ আমাদের সকলের সোনার বাংলা।

"রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। দেশকে মুক্ত ক'রে ছাড়বো ইনশাল্লাহ" জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই পবিত্র বাণীই বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা দিয়েছিলো, জনগণের মধ্যে সাহস এনেছিলো। তাই শত কষ্টেও মানুষ বেঁচে থাকার আশা ছাড়েনি। আজ এত বছর পর আমার জীবনের পড়ন্ত বেলায় স্মরণ ক'রে যাই মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোকে। আমাদের বাসার রেললাইন পাহাড়া দিতো পাকিস্তানী মিলিটারী সেনারা। থাকতো আমাদের দোতালা বাড়ির নিচের উঠানে। ঘুমাতো উঠানে। দুপুরে, রাত্রে ওদের খাবারের জন্য বড় বড় রুটি দিয়ে যেতো আর ওরা খেতো, আমরা দোতালা থেকে দেখতাম। আমরা আশে-পাশের সবাই ভয়ে ভয়ে থাকতাম। কিন্তু পাকিস্তানী সৈন্যেরা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে রেললাইন পাহাড়া দিতো। মাঝে মাঝে রেললাইনে গুলির শব্দে আমরা আতংকিত হ'য়ে উঠতাম। বিশেষ ক'রে রাত্রে কার্ফু চলাকালে গুলির শব্দে স্তব্ধ অন্ধকারকে আরো আতংকিত ক'রে তুলতো। রাতে কুকুরের কান্না কার্ফু রাতকে আরো কালো ক'রে তুলতো। ট্রেনে বাড়ি যাবার পথে বন্দুক উঠানো পাকবাহিনী দেখে দম বন্ধ হ'য়ে আসতো। তখন মানুষ এমনি ভাবেই চলতো।

৬৯ এর গণ আন্দোলন, ৭০ এর নির্বাচনকালীন অবস্থা আর ৭১ এর ১ মার্চ হ'তে ২৬ মার্চ বাংলার মানুষের জন্য এক নতুন ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। তারপর দীর্ঘ নয়মাস মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় পার ক'রে পাক-বাহিনী, আলবদর, আলশামস রাজাকারদের তাণ্ডবে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় স্বজন হারানোর বেদনা, নারী নির্যাতন, ডাকাতি, লুটপাটসহ কিনা ঘটে গেছে এই দেশে। তবুও নতুন আশার আলোকে বাংলার জনগণ এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাঁচতে শিখেছে। এই মুক্তি যুদ্ধে কত মা সন্তান হারা হয়েছে, কত মেয়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, কত স্ত্রী স্বামী হারা হয়েছে। তাঁদেরই পবিত্র রক্তে উর্বরা হয়েছে বাংলার মাটি আর সবুজ শ্যামল আমাদের জন্মভূমি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণ জয়ন্তীতে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করছি এবং জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

জয় বাংলা, বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক॥

খোলা জানালা

ঈগলের সাতটি নীতি মানব জীবনের শক্তি

ফাদার গৌরব জি. পাথাং সিএসসি

বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে আমরা ঈগলের গুণাবলী, আচার-আচরণ, উপমা কিংবা তুলনা এসব দেখতে পাই। বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ গ্রন্থে ঈগলের সাথে ঈশ্বরের ভালবাসা, মানুষের প্রতি বিশেষ যত্ন ও তাঁর আশ্রয় তুলে ধরা হয়েছে।

"ঈগল যেমন ক'রে নীড়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে, শাবকদের উপর যেমন ক'রে ডানা মেলে উড়তে থাকে

তিনি তেমনি ক'রে ডানা মেলে তাকে ধরলেন,

আপন পালকের উপরেই তাকে তুলে বহন করলেন *(দ্বিতীয় বিবরণ ৩২: ১১)*। "

আবার প্রত্যাদেশ গ্রন্থেও ঈগলের বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে, "কিন্তু সেই নারীকে বিরাট সেই ঈগলের ডানা দেওয়া হল, যেন সে মরুপ্রান্তরে সেই আশ্রয়স্থলেই উড়ে যায়, যেখানে সাপের দৃষ্টির আড়ালে তাকে 'এক কাল ও দুই কাল ও অর্ধেক কাল' যত্ন করা হবে *(প্রত্যাদেশ ১২:১৪)*।" এমনি ক'রে বাইবেলের বিভিন্ন গ্রন্থ যেমন যোব, সামসঙ্গীত, প্রত্যাদেশ গ্রন্থে বার বার ঈগলের বর্ণণা দেওয়া আছে। বাইবেলের ঈগলের উল্লেখ দেখার পর ড. মাইলস্ মুনরো (Dr. Myles Munroe) বাহামা দেশের একজন খ্রিস্টান প্রচারক, লেখক ও অধ্যাপক ঈগল নিয়ে গবেষণা করেন ও খুঁজে পান সাতটি নীতি। যে নীতিগুলো মানব জীবনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ যা অনুপ্রেরণাদায়ক এবং চলার জীবনে শক্তিদায়ক। এ নীতিগুলো অনুসরণ করতে পারলে মানব জীবন উন্নত হবে।

নীতি-১: বন্ধু বাছাই করা

ঈগল অনেক উঁচুতে উড়ে এবং কখনোই চড়ুই কিংবা অন্যান্য ছোট পাখিদের সাথে মেশে না, উড়েও না। ঈগল যে উচ্চতায় উড়ে বেড়ায়, সেই উচ্চতায় অন্য কোন পাখি পৌঁছাতেও পারে না। এজন্যই ঈগল একাই উড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন লিখেছেন, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।" ঈগল এই 'একলা চলো' নীতিতে বিশ্বাসী। কাক-চড়ুই, কিংবা অন্যান্য পাখি যেহেতু ঈগলের সমান এতো উঁচুতে উড়তে পারে না, তাই ঈগল তাদের সাথে দল বাঁধে না। মানুষ হিসেবে তোমাকেও জীবনে চলার পথে এমন মানুষদের সাথেই চলতে-ফিরতে-মিশতে হবে যারা তোমার সমমনা, তোমার মতই স্বপ্ন দেখে, যাদের সাথে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি মিলে, যাদের সাথে থাকলে তোমার ব্যক্তিগত উন্নতি হবে। বন্ধুত্ব করতে হবে সম-মানসিকতার মানুষের সাথে এবং এড়িয়ে চলতে হবে এই কাক ও চড়ুইদের যাদের সাথে তোমার জীবনের লক্ষ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

নীতি-২: লক্ষ্যে স্থির ও অবিচল থাকা

"তোমারই বুদ্ধিতে কি বাজ পাখি উড়ে,
ও দক্ষিণ দিকে তার পাখা মেলে যায়?
তোমারই আদেশে কি ঈগল উর্ধ্বে ওঠে,
ও উচ্চস্থানে বাসা বাঁধে?"
সে শৈলের মধ্যে বসতি করে, সেইখানে রাত কাটায়,
সেই শৈলের চূড়ায় ও সর্বোচ্চ স্থানে থাকে।
সেখান থেকে সে শিকার অবলোকন করে,
তার চোখ দূর থেকে তা লক্ষ্য করে। *(যোব ৩৯:২৬-২৯)*।

ঈগলের রয়েছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি যার মাধ্যমে সে আকাশে থাকা অবস্থাতেই শিকার দেখতে পায়। ঈগল যখন তার শিকার খোঁজে, তখন তার দৃষ্টি ও ফোকাস থাকে শিকারের ওপর। যত বাধাই আসুক না কেন, সেটিকে না পাওয়া পর্যন্ত ঈগল কোনক্রমেই তার চোখ সরায় না। ঈগল যেমন সুস্পষ্ট ভাবে সব কিছু দেখতে পায়, কিন্তু ফোকাস করে শুধু একটি প্রাণীর ওপরে, তেমনিভাবে তোমাকেও সবকিছু জানতে হবে, খোঁজ খবর রাখতে হবে তবে ফোকাস রাখতে হবে যেকোন একটি কাজের উপর। নিজেকে জানো, জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করো এবং সেই একটি লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে যাও। যত বিপত্তিই আসুক না কেন, তোমার লক্ষ্য ও ফোকাস যেন না হারায়।

নীতি-৩: পুরাতন ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করে নতুনের সন্ধান করা

ঈগল সর্বদা জীবন্ত প্রাণীকে শিকার করে এবং খাবার হিসেবে খেয়ে থাকে। সে কখনোই কোন মৃত প্রাণী ভক্ষণ করে না। রোজ রোজ নতুন শক্তির চাহিদায় ঈগল পাখি কখনোই মৃত কিছু না খেয়ে বরং জীবন্ত ও নতুন কোন শিকারের পিছে ছুটে। ঠিক একই ভাবে, গতিশীল পৃথিবীতে নিজেকে এগিয়ে রাখার লক্ষ্যে নিজেকে সর্বদা নতুন সব তথ্য দিয়ে আপডেট রাখতে হবে। প্রতি সেকেন্ডেই বদলে যাচ্ছে অনেক কিছু। তাই সার্বক্ষণিক তোমাকেই জানতে হবে সর্বশেষ খবর ও তথ্য। জীবনের লক্ষ্য আরোও স্পষ্ট করার জন্য এসব নতুন তথ্য নতুন শক্তির যোগান দেয়। তাছাড়াও আশেপাশের কিছু মানুষ মৃত ও পচা মাংসের মতই। তারা সর্বদা এমন সব কথাই বলে যা আমাদের নিরুৎসাহিত করে। তবে এখানেই শিক্ষা নিয়ে হাজির হয় ঈগল পাখি। সে যেমন চড়ুই, কবুতরের মতো পাখিদের মতো নিরুৎসাহিত না হয়ে আরও উচুঁতে উড্ডয়ন করে, তোমাকেও কোনো কিছুতে কান না দিয়ে ঈগলের মতোই এগিয়ে যেতে হবে নিজের স্বপ্নে পৌঁছার জন্য।

নীতি-৪: চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা ও এগিয়ে যাওয়া

ঝড় আসলে ঈগল পাখি তা এড়িয়ে না গিয়ে বরং ঝড়ের বেগকেই কাজে লাগিয়ে উচুঁতে উড়ে যায়। অন্যান্য পাখিরা যখন পাতা ও গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, ঈগল তখন ঝড়ের বিরুদ্ধে তার ডানা ঝাপটে যায় এবং ঝড়ের বেগকেই কাজে লাগিয়ে মেঘকে ভেদ করে উপরে উঠে যায়। এমনকি একবার বাতাসের বেগ পেয়ে গেলেই ঈগল তার ডানা ঝাপটানো বন্ধ করে দেয় এবং স্বয়ংক্রিয় ভাবেই উপরে যেতে থাকে। ঝড়কে সে যেন খুব ভালবাসে। চ্যালেঞ্জকে চ্যালেঞ্জ নয়, সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে। অন্য সব পাখি আশ্রয়ের জন্য যখন জায়গা খুঁজে, ঈগল তখন ঝড়ের মাঝেও উড্ডয়নে মগ্ন থাকে। ঝড়ের বেগকেই কাজে লাগিয়েই ঈগল টিকে থাকে বৈরী আবহাওয়ায়। তাই সাফল্য পিপাসু একজন স্বপ্নবাজকেও প্রতিটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। একমাত্র প্রতিকূল পরিস্থিতিই পারে নতুন কিছু শেখাতে, সমস্যা সমাধানের দারুণ ক্ষমতাটি বাড়াতে।

অতএব চ্যালেঞ্জ আসলে এড়িয়ে না গিয়ে তার মুখোমুখি হতে হবে, দৃপ্ত হাতে লড়াই করতে হবে। চ্যালেঞ্জকে বাধা হিসেবে না দেখে বরং শক্তিতে পরিণত করতে হবে, ঠিক যেভাবে ঈগল করে থাকে। ভয় না পেয়ে মনের শক্তি নিয়ে যেতে হবে।

নীতি-৫ অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধতায় বিশ্বস্ত থাকা

একটা মেয়ে ও ছেলে ঈগল যদি কখনো বন্ধু হতে চায়, মেয়ে ঈগলটি প্রথমেই ছেলে ঈগলটির কমিটমেন্টের পরীক্ষা নিয়ে নেয়। কীভাবে? সাক্ষাৎ হওয়ার পর মেয়ে ঈগলটি মাটিতে নেমে এসে গাছের একটি ডাল তুলে নেয়। তার পিছে পিছে ছেলে ঈগলটিও উড়ে যায়। মেয়ে ঈগলটি সেই ডাল নিয়ে উপরের দিকে উঠে যায় এবং একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় যাওয়ার পর গাছের সেই ডালটি নিচে ফেলে দেয়। তার পিছু নেওয়া সেই ছেলে ঈগলটি তা দেখে ডালটি ধরার জন্য দ্রুত নিচের দিকে যায়। ডালটি সে মেয়ে ঈগলের কাছে ফিরিয়ে আনে। এই কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি কয়েক ঘন্টা ধরে হতেই থাকে যতক্ষণ না মেয়ে ঈগল আশ্বস্ত হয় যে ছেলে ঈগলটি এই ডাল ফিরিয়ে আনার কাজটি আত্মস্থ করতে পেরেছে। এটা তার ছেলে ঈগলটির প্রতিজ্ঞাবদ্ধতার পরিচয় তুলে ধরে। একমাত্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধতার পরিচয় দিতে পারলেই পরে তারা দুজনেই বন্ধু হতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে ঈগলের মত ব্যক্তিগত জীবনেই হোক আর পেশাগত জীবনেই হোক, কারোর সাথে কোনো চুক্তিতে বা সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার আগে তার Commitment যাচাই করে নিতে হতে পারে। এমন কারোর সাথে যোগ দিতে হবে যে কাজের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও মনোযোগী। বিবাহিত জীবনই হোক, কিংবা ব্রতীয় জীবনই হোক সব ক্ষেত্রেই কমিটমেন্ট দরকার। কথা দিয়ে কথা রাখা এবং না পারলে সময় থাকতেই অপারগতার কথা জানানো দরকার। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই কমিটমেন্টের অভাব লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই অজুহাত দিয়ে, ভুলে যাওয়ার দোহাই দিয়ে কিংবা ট্র্যাফিক জ্যামের কথা বলে নিজের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করে।

নীতি-৬: পতনে-উত্থানে মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে

ডিম পাড়ার সময় আসলে বাবা ও মা ঈগল পাহাড়ের এমন একটি জায়গা বেছে নেয়, যেখানে কোনো শিকারীর হামলা করার সুযোগ থাকে না। বাসা তৈরীর পালা আসলে ছেলে ঈগল এই বাসা নির্মাণের জন্য প্রথমে কিছু কাঁটা বিছায়, তার উপর গাছের ছোট ছোট ডাল, তার উপর আবার কিছু কাঁটা দিয়ে একদম শেষে কিছু নরম ঘাস বিছিয়ে দেয়। ছোট্ট আবাসটির নিরাপত্তার জন্য বাইরের দিকে তারা কাঁটা ও শক্ত ডাল বিছিয়ে রাখে।

বাচ্চা ঈগলগুলোর যখন উড়তে শেখার সময় হয়, মা ঈগল তাদেরকে বাইরে ছুঁড়ে দেয় কিন্তু পড়ে যাওয়ার ভয়ে ছানাগুলো ফিরে আসে। মা ঈগল এবার সব নরম ঘাস সরিয়ে ফেলে পুনরায় তাদের বাইরে ছুঁড়ে দেয়। আর তাই ছানাগুলো যখন ফিরে আসে, কাঁটার সাথে আঘাত পেয়ে তারা নিজেরাই বাইরে ঝাঁপ দেয় এই ভেবে যে এত প্রিয় মা-বাবা কেন এমন করছে? এবারে বাবা ঈগল নিয়োজিত হয় তাদের উদ্ধারকার্যে। নিচে পড়ে যাওয়ার আগেই সে তার পিঠে করে ছানাগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। যতদিন পর্যন্ত ছানাগুলো তাদের ডানা ঝাঁপটানো না শুরু করে, এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

এখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার মতো অনেক কিছুই আছে।

- এরকম সুরক্ষিত আশ্রয় গড়ে তোলার এই প্রস্তুতি আমাদের শেখায় যেকোনো পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার।
- পরিবারে সব কাজে প্রত্যেকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সর্বদাই কাম্য। তা পরিবারের ছোট সদস্যদের কাছেও একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়।

বাচ্চা ঈগলের গায়ে কাঁটা লাগায় তারা শেষ পর্যন্ত ডানা ঝাঁপটানো শুরু করে এবং তখনই প্রকৃতপক্ষে নতুন একটা বিষয় আবিষ্কার করে। তারা আবিষ্কার করে যে তারা উড়তে পারে। অতএব এখান থেকে আমাদের শেখা উচিৎ যে, আমরা যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, সারা জীবন ওখানেই থাকলে আমরা নতুন কিছু শিখব না, জীবন সম্বন্ধে জানাবো না, নিজের ক্ষমতাগুলো নিয়ে অবগত হব না। এক কথায় Comfort Zone থেকে বের হতেই হবে। নচেৎ নতুন কিছু শেখা কখনোই সম্ভব নয়। যেকোনো রকম পরিবর্তনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকো। অভিযোজনে অভ্যস্থ হও অর্থাৎ যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে শিখো। আর ভুলো না যেঃ "Life begins at the end of your comfort zone". Comfort zone থেকে না বেরোলে জীবনে অগ্রগামী হওয়া প্রায় অসম্ভব। পৃথিবীতে আর যা কিছুই হয়ে যাক, বাবা-মা কখনোই সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না। মা ঈগল তার ছানাগুলোকে ছুঁড়ে দিতে চায় যেন তারা উড়তে শিখে, আর বাবা ঈগল তাদের পড়ে যাওয়া হতে বাচাঁয়। এমনিভাবে পরিবারেও পিতা-মাতা সন্তানকে লালন পালন করে থাকেন। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গমাতা কবিতায় লিখেছেন, "পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে /মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।"

নীতি-৭: আশা নিয়ে পথ চলা

ঈগল ৭০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। কিন্তু ৪০ বছরের পরই ঈগলের ঠোঁট, ডানা, থাবা, নখ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। বয়স বাড়ার সাথে ঈগল পাখির ডানার পালকগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, যে কারণে সে আগের মত দ্রুত গতিতে উড়তে পারে না। তখন তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় সে কি আত্মহত্যা করবে নাকি শকুনের মত মৃতদেহ খেয়ে বেঁচে থাকবে। তখন ঈগল নতুন করে বেঁচে থাকার আশা নিয়ে কষ্ট করে ও সংগ্রাম করে। দুর্বল বোধ করলে সে এমন একটি জায়গায় আশ্রয় নেয় যেখানে পাথর রয়েছে। সেখানে সে তার শরীরের প্রতিটি পালক পাথরে ঘষে ঘষে তুলে ফেলে। আর নতুন পালক না গজানো পর্যন্ত সেই দুর্বল ঈগল কোথাও বের হয় না। নতুন পালক গজিয়ে গেলে সে পুনরায় বজ্র গতিতে উড়ে বেড়ায়। যেমন বাইবেলে আছে, "তাই তোমার যৌবন ঈগলের মত নবীন হয়ে ওঠে *(সামসঙ্গীত ১০৩:৫)*।"

তুমিও একটু বিশ্রাম নাও। যখনই কাজ, দায়িত্ব, পড়াশোনার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে হাঁপিয়ে উঠবে, তখনই সিদ্ধান্ত নাও একটু বিরতি নেওয়ার। ছোট্ট একটি ছুটি নাও, সময় বের করো নিজের জন্য। এ সময়টিতে একান্তে চিন্তা করো কোন কাজটি তোমার কাছে অর্থপূর্ণ এবং কোনটি তোমার করার একেবারেই প্রয়োজন নেই। ঈগলের মতো তুমিও ঘাড় থেকে একেবারেই ঝেড়ে ফেলো সেসব অপ্রয়োজনীয় কাজের দায়িত্ব যা তোমার চলার গতিকে মন্থর করছে, এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেই সাথে, নিজেকে যাচাই করে দেখো যে কোন কোন বদ অভ্যাসে তুমি বর্তমানে অভ্যস্ত। ঈগল পাখির মতোই ঝেঁড়ে ফেলো সেসব বদ অভ্যাস; পুনরায় শুরু করো নতুন পথচলা। আমাদের উচিৎ বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করা। নিজেকে **Re-energize** করো॥

তথ্যসূত্র: টেন মিনিট স্কুল ব্লগ

খোলা জানালা

পিতামাতা-সন্তান ও পরিবারের ভবিষ্যৎ

ড. ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা

ইতিহাসের কোন কালেই কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের এত আত্মহত্যা হয়নি যা একালে হচ্ছে। বিগত কয়েক বৎসরের হিসাবটাই যদি ধরি তাহলে দেখা যাবে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তাছাড়া আত্মহত্যার প্রবণতাও অনেক ছেলেমেয়েদের মধ্যে লক্ষনীয়। কিশোর-কিশোরীরা তো নাবালক-নাবালিকা। আত্মহত্যা করতে গেলেতো বুঝতে হবে যে কেন বা কি কারণে এই অঘটন ঘটাতে চায়। বুঝতে হবে জীবনের অর্থ আর খুঁজে না পাওয়ার গুরুত্ব। তারা তো জীবনটা শুরুই করলো না নিজ দায়িত্বে জীবনটার ভার বহন করার তবে এ বয়সে আত্মহত্যা কেন? এটা কিন্তু অনেক প্রশ্নের উদ্রেক করে।

আত্মহত্যার অনেক কারণ থাকে। তবে এক পর্যায়ে যখন কেউ হতাশায় ডুবে যায় তখন এই রকম দুর্ঘটনা ঘটাতে বোকা সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই কিশোর-কিশোরী বয়সের ছেলেমেয়েদের আবার হতাশা কি? আসলে হতাশা জাগে না পাওয়া থেকে। তবে বাহ্যত এখনকার ছেলেমেয়েরাতো প্রত্যাশার চেয়ে বেশীই পাচ্ছে। এই বেশি পাওয়ার পিছনে তবে কি না পাওয়ার কিছু আছে যে নিজের জীবন শেষ করে দেয় এবং পিতামাতাকে অপূরণীয় কষ্ট ও শোকের মধ্যে ভাসিয়ে দিয়ে যায়? এটা সর্বোতভাবে সত্য, যে পরিবারে বেশি সন্তান সেই পরিবারে আত্মহত্যা কম এবং যে পরিবারে কম সন্তান সেই পরিবারে আত্মহত্যা বেশি। বেশি সন্তানের ভাগাভাগিতে সীমাবদ্ধতা আছে যেখানে নির্ভরতা আছে আর কম সন্তানের মধ্যে পাওয়া-প্রাচুর্য্য অনেক যেখানে স্বার্থপরতা বেশি।

পরিবারে একজন-দুজন সন্তান হওয়ায় তাদের প্রতি পিতামাতার সোহাগ আদর এত বেশি থাকে যে পরে এই বেশির ক্ষুধাটাই একটা অভাব বা শুন্যতা সৃষ্টি করে। এর লক্ষণটা কিন্তু প্রথমে পিতামাতার মধ্যেই ফুটে উঠে। দু-এক সন্তান নিয়ে তারা খুব দুঃশ্চিন্তায় থাকে, ভয়ে থাকে এবং তাদের ব্যাপারে ভালোবাসার নামে অন্ধ থাকে। ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে সব দিয়ে, তাদের সব দাবি মেনে নিয়ে, সব 'হ্যাঁ'কে মেনে নিয়ে, সব ইচ্ছাকে তারা পূরণ করতে বাধ্য থাকে। তাদের বড় করতে গিয়ে পিতামাতা তাদের প্রতি এমন অন্ধ হয়ে যায় যে তাদের 'না' বলতে যে শিখাতে হবে সেটা তারা ভুলে যায়। তাদের 'না'-কেও যে মেনে নিতে হবে এবং তাদের শাসন-বারণ যে মানতে হবে সে বিষয়ে পিতামাতাগণ খুব অপরিপক্ক ভূমিকা রাখেন। এটাই এখানে বড় অভাব।

পিতামাতাদের একটা ভয়-শংকা থাকে সন্তানের বেপরোয়া দাবিকে না করতে গিয়ে যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়? এখানে পিতামাতাগণও তাদের নিজেদের আবেগের কাছে হার মানে। এরকম অবস্থা থেকেই সন্তানের সব ইচ্ছা, সব চাহিদা মেনে নেওয়াতে একটা ভুল শিক্ষা দিয়ে তাদের জীবন গঠন শুরু। এখন যদি কোন অপ্রয়োজনীয় বা তার জীবনের গঠনের জন্য ক্ষতিকর কিছুকে 'না' বলতে বা 'না' কে মেনে নিতে শিখানো না হয় তা হলে সে বড় হয়ে পিতামাতার কোন 'না' কে বা শাসন-বারণকে সহজ ভাবে মেনে নিবে না এবং গ্রহণ করবে না। নিশ্চিতভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাবে। এখন যদি সন্তানের ভালোর জন্য প্রয়োজনে একটা- দুটো 'চড়'- 'থাপ্পর' মেরে সঠিক শিক্ষা-শাসন করা না হয় তা হলে বড় হলে যে কোন বড় দোষের জন্য একটা ছোট্ট 'চড়'-'থাপ্পর'ও কখনো মেনে নিবে না। বরং এ জন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুধু নয় ধংসাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখাবে। পিতামাতা তাদের সন্তানদের ছোট বেলা থেকে কোন চ্যালেঞ্জ দিয়ে যদি কোন শিক্ষা না দেন তাহলে পরে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী বয়সে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কোন কিছুই গ্রহণ করতে চাইবে না। এখন থেকে তাদের যদি কোন গৃহস্থালির কোন কাজ শিখানো না হয় তা হলে সে পবিরারের কোন কাজকে ভালোবাসবে না, কাজে উদাসিন হবে, স্বার্থপর হবে। নিজের জীবন নিয়েও উদাসীন থাকবে।

শুনা গেছে কেউ আত্মহত্যা করেছে মা'র একটা থাপ্পর-এর জন্য যা সে কখনো আশাও করেনি যে পিতামাতা তাকে মারবে বা তার উপর হাত তোলবে। কেউ আত্মহত্যা করেছে পিতামাতার কাছ থেকে প্রেমে বাধা পেয়ে, তাদের শাসন মেনে নিতে না পেরে। কেউ আত্মহত্যা করেছে প্রেমে প্রত্যাখাত হয়ে অর্থাৎ অপর পক্ষ থেকে সাড়া না পেয়ে। কেউ আত্মহত্যা করেছে তার কোন আবদারে পিতামাতার সায় না পাওয়ায়। কেউ আত্মহত্যা করেছে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে। কেউ আত্মহত্যা করেছে সে জানেও না কি কারণে। আজকাল এমন বয়সে আত্মহত্যা করে সে জানেও না যে সে কি করতে যাচ্ছে। এসব কারণে কেউ আত্মহত্যা করলে আমরা বলি 'বোকা', 'কাপুরুষ'। কিন্তু বোকামী করে হোক বা যা করেই হোক জীবনটাকে তো শেষ করে দিচ্ছে। আসলে এগুলোইকি কারণ? এরকম অর্থহীন, অবুঝ, খেয়ালী ও বাতিকগ্রস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে আসলে কিন্তু চ্যালেঞ্জিং কোন পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত না নিতে পারাটাই কারণ। কারণ চ্যালেঞ্জ ছাড়া জীবন নেই, জীবনের গতি নেই, গৌরব নেই।

চড়-থাপ্পর, শাসন-বারণ, বাধা-প্রতিকুলতা, প্রেমে ব্যর্থ হওয়া বা সাড়া না পাওয়া, নিজের আশানুরূপ কোনকিছু পুরণ না হওয়া এগুলো জীবনের অংশ। যখন ছোটবেলা থেকে শাসন-বারণ এবং নিজের ইচ্ছা পুরণে 'না' শুনার এবং 'না' বলার সঠিক শিক্ষা না পায় তা হলে এই বয়সে এসে শাসন-বারণ বা 'না' শুনাটা তার জন্য বড় একটা ধাক্কা। তখন কেউ কেউ এই ধাক্কাটাই সামলাতে পারে না। আসলে এখানে এই বয়সে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বা জীবনে ঘোর হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যে এই রকম কাজ করে তা কিন্তু নয় রবং এটা একেবারেই খেয়ালী বা হুজুগে বা আবেগী ঘটনা। এটা দুর্ঘটনাও না। আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে, মূল্যায়ন করতে হবে এবং আসল কারণ খুঁজে বের করতে হবে। হ্যাঁ, আসল কারণ অন্য কোথাও যার ফলে তার পরিণতি হিসাবে এইরকম দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু, যার জন্য পিতামাতা সন্তানহারা হওয়া, যার জন্য পিতামাতা ও পরিবারের মধ্যে বিলাপ নেমে আসা। পিতামাতাগণ যদি এখনো সচেতন না হয় তা হলে ভবিষ্যতে অনেক পরিবারেই পিতামাতা সন্তানহারা হবে।

বুঝতে হবে এই বয়সটা আবেগের বয়স। বাস্তবতা থেকে অনেক দুরে পুরোটাই ভাবাবেগের সন্ধিকাল। মোহ-আবেগ-অস্থির-

চাঞ্চল্য-ভ্রান্তি-ব্যাকুলতা নিয়ে এই বয়স। এই বয়োসন্ধিকালে যখন আবার এগুলোর মাঝে নিজের ইচ্ছা পূরণে বাধা আসে বা শাসন-বারণ আসে তখন এই আবেগ অস্থিরতা তাকে বিভ্রান্ত করে এবং সে সবকিছু তখন অর্থহীন মনে করে। পরিণামে হুজুগে ঘটনা ঘটায়। তাই এর পিছনে কিন্তু মূল কারণ ছোটবেলায়ই তার গঠনে কিছু না হওয়া থেকে, না পাওয়া থেকে, কিছুর শূন্যতা থেকে, কিছুর অপূর্ণতা থেকে।

আমরা অনেক পরিকল্পনা করেই পরিবার গঠন করি। কি করি? আগে থেকেই একটা মনোবিরাগ কাজ করে সন্তান নেওয়া বা নেওয়ার ব্যাপারে। তারপর কোন সুপরিকল্পনা করেও সন্তান নেওয়া হয় না। উপরন্ত একজন বা রড়জোর দুজন সন্তান। আসলে বিবাহের মুল আহ্বান হলো পরিবার গঠন করা। হিসাবে দেখা যায় সেইসব পবিরারেই এরকম দূর্ঘটনাগুলো ঘটছে। বড় পরিবারেতো এরকম দূর্ঘটনা নেই। থাকলেও নজির খুবই কম। তাহলে কারণটা কোথায়। এর পিছনে অনেকগুলো প্রশ্ন। আমাদের সন্তান কি আমাদের ভালোবাসার ফসল? সন্তান নিতে আমাদের এত হিসাব কেন? সন্তানকে কি ঈশ্বরের দান হিসাবে আমরা গ্রহণ করি? সন্তান নিতে কি আমরা দ্বিধাদ্বন্দে ভোগি? গর্ভে সন্তান আসার পর কি আমাদের কোন দ্বিধা কাজ করে? সন্তানকে কি বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছি? দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে ভালোবাসার চর্চাটি কি সক্রিয় রেখেছি? সন্তানের সামনে কি পিতামাতা হিসাবে সুআদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখেছি? সন্তান কি অধিকাংশ সময় আমাদের (পিতামাতার) কাছ থেকে দূরে ছিল? সন্তানকে কি বাড়ির আয়া দিয়ে বড় করেছি? সন্তানের সামনে কি স্বামী-স্ত্রী হিসাবে আমরা অবিশ্বস্ত ছিলাম? সন্তানকে কি শুধু টাকায় রড় করেছি? যা চেয়েছে তা দিয়েই কি খুশী রেখেছি? যেটা প্রয়োজন নেই সেখানে কি কখনো না বলতে শিখিয়েছি? কখনো কি শাসন -বারণ করে সঠিক শিক্ষা দিয়েছি? কত বৎসর পর্যন্ত সন্তানকে মুখে তুলে খাইয়েছি? সন্তানের প্রতি কি আমরা অতি সোহাগ-ভালোবাসায় অন্ধ? সন্তানকে নিয়ে কি খুব আতংকিত? ছোট বেলায় সন্তানকে কি আমরা সময় দিয়েছি? তার সাথে বন্ধুর মত সম্পর্ক গড়ে তুলেছি? আমাদের সন্তানকে কি তার জন্য আরো ভাইবোন দিয়েছি? তার বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায়ই কি শুধু হাজার হাজার টাকা খরচ করেছি? তার বিশ্বাসের চর্চায় কি খাটতি আছে? তার হৃদয়বৃত্তি চর্চায় ও গঠনে কি ঘাটতি ছিল? সন্তানকে ঠান্ডা রাখার জন্য তাকে মোবাইল দিয়ে কি বসিয়ে রেখেছিলেন? এই প্রশ্নগুলো করার কারণ রয়েছে। কারণ হলো সুষ্ঠ ও সঠিক গঠনের জন্য ও তার জীবনের শক্ত ভিত্তি দেওয়ার জন্য পিতামাতা হিসাবে আমাদের দায়দায়িত্বে সঠিক নমুনা ও পথ-পাথেয় গুলো এই প্রশ্নগুলো থেকে পাওয়া যাবে। এরূপ বয়সের কিশোর-কিশোরীর আত্মহত্যা, সন্তান বখাটে হওয়া, তাদের জীবন ব্যর্থ হওয়া ও যে কোন প্রতিকূল অবস্থা বা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যর্থ হওয়ার পিছনে কি কারণগুলো নিহিত তা উপরের প্রশ্নগুলোর মধ্যেই উত্তর রয়েছে।

কিছু বিষয় আমাদের ভালো লাগবে না, মনোকষ্ট দিবে তবুও বলতে হয়। প্রথমত: দেখুন একজন সন্তান এনে তাকে বিপদে ফেলবেন না। নিজেরাও কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন? আপনারা তো দু-এক সন্তান এনে দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে চেয়েছেন তাই না? দুশ্চিন্তা মুক্ত কি হতে পেরেছেন? পৃথিবীতে এমন নজীর খুব কম আছে পরিবারে বেশী সন্তান এনে কোন বাবা-মা হাহাকার করেছে বা আপসোস করেছে। কিন্তু বর্তমানে অনেক অনেক বাবামা আছে যারা এক-দু সন্তান এনে বিলাপ করছে, হাহাকার করছে।

দ্বিতীয়ত: সন্তান ঈশ্বরেরে দান। পিতামাতার ভালোবাসার ফসল। পরিবার মানেই পিতামাতা হওয়া। আপনারা পিতামাতা হওয়ার আহ্বান পেয়েছেন। সুপরিকল্পনা করুন। সন্তানকে ঈশ্বরের দান হিসাবে গ্রহণ করুন। সন্তান জন্মদানে উন্মুক্ত থাকুন। এত হিসাব কষবেন না। সন্তানকে গর্ভে রেখে হা-হুতাশ করবেন না। তাকে আনবো কি আনবো না সেই দ্বিধাদ্বন্ধে থাকবেন না। তাহলে সে নিজেকে অবাঞ্ছিত ভাববে। নিজেকে ভালোবাসবে না। পৃথিবীকে ভালোবাসবে না। জীবনকে ভালোবাসবে না।

তৃতিয়ত: সন্তানকে তার জন্য ভাইবোন দিন। একাকী করে রাখবেন না। ভাইবোনহীন একাকী সন্তান একাকীত্বে ভুগবে। ভালোবাসা শিখবে না, সহভাগিতা শিখবে না, দরদ শিখবে না ও নিজের এবং অন্যের জন্য কষ্টভোগ ও মায়া শিখবে না। স্বার্থপর হবে, নিষ্ঠুর হবে ও নিরাশ হবে। ভাইবোন হবে চলার সাথী, আনন্দে সহভাগি, কষ্টে সমব্যথী, খেলার সাথী। ছোটবেলা থেকেই এইগুলো থাকলে তাদের একাকীত্বের সুযোগই থাকবে না। খেলতে খেলতে, ভালোবাসতে বাসতে সুন্দর মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে যাবে এবং পরস্পর-পরস্পরে সহযাত্রী হয়ে এগিয়ে যাবে।

চতুর্থত: বাবা-মাগণ সন্তানদের ভালোবাসুন। ভালোবাসা অতি সোহাগে বা অতি আদরে নয়, যা চায় তা দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করার মধ্যদিয়ে নয়। সময় সময় তাকে না বলতে শিখান, ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝান, প্রয়োজনে শাসন-বারণ করুন। ভারসাম্যহীনভাবে বড় করবেন না। পিতামাতাগণ উভয়েই মিলে তাদের সময় দিন, খোঁজ-খবর রাখুন, একসাথে খেলাধুলা করুন। স্বামী-স্ত্রী হিসাবে নিজেদের মধ্যে অমিল দূর করে পরস্পর বিশ্বস্ত থাকুন। তাদের সামনে ঝগড়াবিবাদ এড়িয়ে চলুন। তাদের সামনে সুদৃষ্টান্ত রাখুন। অন্যদিকে সব সময় নেগেটিভ ভাবে সব কিছু দেখবেন না । 'পারে না', 'বুঝে না', 'তোমাকে দিয়ে হবে না' এরূপ কথাবার্তা পরিহার করুন। তাদের সাহস দিন, উৎসাহিত করুন, প্রশংসা করুন।

পঞ্চমত: নেপোলিয়ন বলেছেন, 'শিশুর প্রথম ছয়টি বছর আমাকে দাও আর বাকী জীবনটা নিয়ে নাও' শিশুর শিক্ষার শুরু কবে থেকে এই প্রশ্নের উত্তরে একজন মনীষী বলেছেন, 'শিশুর শিক্ষার শুরু তার জন্মের বিশ বৎসর আগে থেকে'। পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল বলেছেন, 'Marriage starts in Infancy' অর্থাৎ একজনের বিবাহিত জীবন শুরু হয় তার মা-বাবার কোলে কোলে। এই মূল্যবান বাণীগুলো আনলাম একারণে যে, মানুষের জীবনের শক্ত একটা ভিত্তি গড়ে উঠে তার জীবনের বংশগত পরম্পরা থেকে, তার জন্মলগ্ন থেকে এমন কি তার গর্ভকালীন থেকেই এবং পরের কয়েকটি শিশু বয়সের কালে। এই সময়ে তাকে যা দেওয়া হবে তার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী জীবনের সব কিছু নির্ভর করবে। তাই পিতামাতাদের, অভিভাবকদের অনেক সচেতন থাকতে হবে যে এই বয়সে তাদের কি রকম শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। শিশুদের শিক্ষাটা কিন্তু এভাবে নয় যে এটা কর, ওটা কর বরং তাদের সামনে অভিভাবকদের জীবন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যা তাদের জীবনে পাথেয় হয়ে থাকে বা অনুকরণ করে থাকে। শিশুরা কিন্তু মা-বাবার কোলে কোলে শিক্ষা নিয়ে নেয় যে তারা ভবিষ্যতে কি রকম মানুষ হবে। তাই মা-বাবাগণ শিশুদের সামনে ঝগড়াঝাটি করবেন না, রাগারাগি করবেন না, বিচ্ছেদে যাবেন না। সন্তানেরা এইরকম পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে গেলে তারা মনস্তাত্বিক দ্বন্দ্বে ভোগে, বিভ্রান্ত হয় এবং নিজের জীবনে বিপদ ঘটাতে পারে।

ষষ্ঠত: পড়াশুনা ভবিষ্যৎ সুন্দর জীবন গড়ার জন্য অপরিহার্য। শিশু অবস্থা থেকেই শুধু পড়াশুনা আর পড়াশুনা অর্থাৎ স্কুলে পড়াশুনা, বাড়িতে পড়াশুনা, তারপর প্রাইভেট টিউশনিতেও পড়াশুনা...এটা কিন্তু শিশুদের জন্য অনেক বাড়াবাড়ি। এর পিছনে যত টাকা লাগে খরচ করতে পিতামাতার দ্বিধা নেই। কিন্তু কোথায় যেন কি শুন্যতা তৈরী হচ্ছে তা কিন্তু পিতা-মাতাগন হয়তবা খেয়ালই করেন না। এই শিক্ষা তাদের শিক্ষিত করবে, জাগতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করবে কিন্তু এর পাশাপাশি যদি ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তি দেওয়া না হয়, বিশ্বাসের চর্চায় অভ্যস্ত করা না হয়, মানবিক ও নৈতিক মুল্যবোধ শিক্ষায় গড়ে তোলা না হয় তা হলে এই শুন্যতা কিন্তু তাকে জীবন সম্বন্ধে মতি গতি দুটারই ভ্রম সৃষ্টি করতে পারে। শুধু বুদ্ধিবৃত্তি এবং পুঁথিবিদ্যায় সন্তানকে বিদ্বান করা যায় কিন্তু প্রকৃত মানুষ করতে হলে তাদের হৃদয়বৃত্তির চর্চা অপরিহার্য। আর এটাই তাকে বাঁচাবে, জীবনের মর্ম বুঝাবে। অন্যথায় সে মানবিকতা বুঝবেনা, সামাজিকতা বুঝবেনা, পরিবার বুঝবেনা, জীবনের নান্দনিকতা বুঝবেনা।

সপ্তম: প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজ, সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার জন্য। জীবনকে কঠিন করার জন্য নয়। প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ার জন্য। পারস্পারিক বন্ধন ও সুন্দর বন্ধুত্ব গড়ার জন্য। প্রযুক্তির ব্যবহার তাকে একাকী হওয়া বা একাকীত্ব জীবনের জন্য নয়। বর্তমানে ছোট বড় সবার হাতে মোবাইল। ছোটদের প্রয়োজন নেই তবু তাদের মোবাইল চাই। আর মা-বাবাগণ তা দিয়ে থাকেন। এটা যে একদিকে যেমন ভালো করতে পারে আবার অন্যদিকে কত যে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে তা আমরা জানি। এটার খারাপ প্রভাবটা প্রথমে পরিবারেই পরে। পরিবারে সবার হাতে মোবাইল তাই এতে তারা এটা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে পরস্পরের জন্য তাদের সময় থাকে না যার ফলে দুরত্ব বাড়ে, কথা বলার লোক থাকে না, একাকীত্ব বাড়ে। আবার এর ফলে বিভিন্ন কারণেই মিথ্যা বলার, লুকোচুরি করার একটা বড় মাধ্যম এই মোবাইল।

তাই পিতামাতাকেই প্রথমে এর সদ্ব্যবহার করতে হবে। তারপর খোঁজখবর রাখুন আপনার সন্তান তা কিভাবে ব্যবহার করছে। কার সাথে কথা বলছে, কার সাথে সম্পর্ক করছে। খেয়াল রাখুন এর অপব্যবহারে কোন অসুস্থ সম্পর্কে জড়িয়ে পরছে কিনা। বড়দের কথা বাদই দিলাম আজকাল কিশোর-কিশোরীরাই এর অপব্যবহারে মনস্তাত্বিক দ্বন্দ্বে ভুগছে। তাই পিতা-মাতাগণ সন্তানের বন্ধু হন। তার ভিতরের কথা জানুন। ফলে দেখবেন তাদেরকে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবেন।

অষ্টম: আগেই বলেছি কিশোর-কিশোরী বয়সটা আবেগের বয়স। বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে পুরোটাই ভাবাবেগের সন্ধিকাল। মোহ-আবেগ-অস্থির-চাঞ্চল্য-ভ্রান্তি-ব্যাকুলতা নিয়ে এই বয়স। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি টান-আকর্ষণের ব্যগ্রতা এই বয়সের বাস্তবতা। প্রযুক্তি পারিবারিক, মানসিক ও মানবিক সব শাসন-বারণকে উপেক্ষা করে অপ্রতিরোধ্য বেগে ও দাপটে সবার উপর প্রভাব খাটাচ্ছে সেখানে এই কিশোর-কিশোরীরাই বেশি করে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। মোহ থেকে শুধু মুগ্ধতাই নয় বরং ভ্রান্তিতে আর আবেগ থেকে শুধু চিত্তচাঞ্চল্যই নয় বরং তাদের মনস্তাত্বিকভাবে বৈরী-বেপরোয়া করে তুলছে। যার ফরে তারা ভালোবাসার নামে শারিরীক সম্পর্কে জড়িয়ে পরছে। সন্দেহ বাড়ছে, অসহিষ্ণু হচ্ছে এবং এইরূপ নিয়ন্ত্রণহীন আবেগের বশবর্তী হয়ে দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে। তাই পিতা-মাতাদের এই সময়ে খুব সচেতন থাকতে হবে।

নবম: কথায় আছে তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপাখি সহজেই পশুপাখি কিন্তু মানুষ অনেক সংগ্রাম ও চেষ্টার ফলে সে মানুষ। একজন মানব শিশুকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে ও নিজে নিজে হাঁটতে এক বছর সময় লাগে। তারপরও সেই শিশুকে আবার অনেকগুলো বছর কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণী হিসাবে পিতামাতার অধীনে থাকতে হয়। তার কারণ হলো তাকে শুধু শারিরীকভাবে গঠন-বৃদ্ধিতেই নয় তাকে মানবিক, সামাজিক, নৈতিক, আবেগিক, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে শক্ত ও গুণগত একটা ভিত্তি দিয়ে পরবর্তী জীবনে জন্য প্রস্তুত করে দিতে হয়। এক্ষেত্রে পিতামাতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এ বয়সের সন্তানদের গঠন দেওয়া ও যত্ন নেওয়া সহজ নয়। উপরন্তু এই প্রযুক্তির যুগে যেখানে মিডিয়ার দাপট-দৌরাত্ব্য ও প্রভাব অপ্রতিরোধ্য সেখানে পিতামাতাকে অনেক সচেতন থাকতে হয়। একটু অযত্ন ও অবহেলায়, পারিবারিকতার সংকোচন-সংকীর্ণতায় ও বাৎসল্যের বন্ধনের শিথীলতায় সন্তানদের মধ্যে বর্তমান social media-র প্রলুব্ধ উপাদানগুলোর প্রাধান্য তাদের মন-মেজাজে এমনভাবে ঢুকে যেতে পারে যা তখন তার জীবনের গতি-গন্তব্য গরমিল করে দিতে পারে।

এর জন্য সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ হলো Proximate Prepaaration. ধর্মপল্লী পর্যায়ে পালকীয় Program-এর মধ্যে জোরালোভাবে এবং নিয়মিতভাবে কিশোর-কিশোরী ও উঠতি যুবক-যুবতীদের জন্য জীবন-যৌবন, আবেগ-ভালোবাসা সম্বন্ধে সঠিক নির্দেশনা দানের জন্য Pedagogy অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। তাদের এই বয়সে মোহ কি, আবেগ কি, কাম-ভালোবাসা কি তার সঠিক অর্থ ও ধারনা দিতে হবে। প্রকৃত ভালোবাসা কি, তার গুরুত্ব অনুধাবন করানো অর্থাৎ মোহ-আবেগ যে ভালোবাসা নয়, কাম চরিতার্থ করা যে ভালোবাসা নয়, প্রকৃত ভালোবাসা যে বাস্তবতাকে এড়িয়ে যায় না বরং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এগিয়ে যাওয়া, ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের যোগ্যভাবে গড়ে তোলা এবং জীবনের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এইসব বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্নভাবে তাদেরকে প্রস্তুত করা ও সঠিক পথ নির্দেশনা নেওয়া খুবই জরুরী।

বর্তমানে পিতামাতাদের, অভিভাবকদের একটু বাড়তি সচেতনতা দরকার তবে বাড়াবাড়ি করে নয় বরং ভালোবাসা-বাৎসল্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় রেখে। তাহলে পিতামাতাদের তাদের সন্তানদের কোনরকর দুঘটনার খবর শুনতে হবে না, তারা তাদের জীবনকে ভালোবাসতে শিখবে, পরিবারগুলো বাঁচবে ও সন্তানেরাও ভবিষ্যতে সুস্থ পরিবার গঠনে প্রেরণা পাবে।

কিশোর -কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের বলি, তোমাদের এই বিশ্বাস ও দৃঢ়তা নিয়ে জীবন যাপন করতে হবে যে, আমি ঈশ্বরেরে সুন্দর সৃষ্টি, আমার জীবনটা ঈশ্বরের মহান দান। আমার জীবনটা আমার ইচ্ছার উপর নয়, অন্যের ইচ্ছার উপরও নয় বরং ঈশ্বরের পরিকল্পনার উপর আমার জীবন। আমার জীবনটা আমার জন্যই শুধু নয় অপরের জীবনের জন্যও। কারণ আমরা মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য। এইভাবেই সবরকম চ্যালেঞ্জ নিয়ে জীবনে এগিয়ে যেতে হয়। তাই প্রথমে নিজের জীবনকে ভালোবাস, দেখবে, পরিবারে সবায়ই কত আপন আর পৃথিবী তোমার কাছে কত সুন্দর॥

খোলা জানালা

পরিবারের যত্নে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা

রীতা রোজলীন কস্তা

পত্রিকায় একটি খবরে সবাই চমকে গিয়েছিলাম এবং মনে হয় সকলেরই মনের একই অবস্থা হয়েছিলো আমার মত। দেশের অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বুয়েটের শিক্ষার্থীরা তাদেরই এক সহপাঠী বন্ধুকে পিটিয়ে হত্যা করেছিলো ২০১৯ এর অক্টোবরের এক রাতে শুধুমাত্র কিছু অনুমানভিত্তিক খবরের উপর ভিত্তি করে। এধরণের খবর এখন প্রায়শই শিরোনাম হয় ।

এছাড়াও সদ্য জন্মানো শিশুকে ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা, শিশু ও নারী ধর্ষণ, সম্পত্তির কারণে ভাইকে মেরে ফেলা, মাদকের জন্য টাকা না পেয়ে ছেলে নিজের মাকে মেরে ফেলছে, ছেলে-মেয়েরা বৃদ্ধ মাকে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে বোঝা মনে করে। এই ধরনের ভীষণ মন খারাপ করা খবরগুলো প্রায় প্রতিদিনই সহজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে আমরা দেখছি ও শুনছি প্রতিনিয়ত।

প্রায় সময়ই বাবা মায়েরা অভিযোগ করেন যে ছেলে-মেয়েরা আমাদের কথা শোনেনা ও কথামত কাজ করে না, সংসারের কোন কাজে বাবা মাকে সাহায্য করে না, শিক্ষকরা বলেন ছাত্র ছাত্রীরা আমাদেরকে মোটেই সম্মান করেনা, নকল করতে না দিলে তারা আমাদের হুমকি দেয়। অপরদিকে ছেলে-মেয়েরা বলে; বাবা মায়েরা আমাদের দেখতে পারে না, আমরা যা চাই তা দেয় না, আমাদেরকে শুধু অন্যের সাথে তুলনা করে। অন্যদিকে অনেক পরিবারের স্বামী স্ত্রীর একের প্রতি অন্যের অভিযোগের অন্ত নেই, একে অন্যকে সহ্য করতে পারে না, পরস্পরকে সন্দেহ করে, চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে ঝগড়া অশান্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে সংসার ভেঙ্গে ছাড়াছাড়ি। কর্মক্ষেত্রে কাজে ফাঁকি দেয়া, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হলেই অন্যের ব্যাপারে কুৎসা রটানো, মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা, বড়লোক হওয়ার নেশায় অথবা পরিবারের চাহিদা মেটাতে অনৈতিক পথে অবৈধভাবে টাকা উপার্জন করা, প্রায় সময়ই মিথ্যা বলা, চাটুকারিতা, চাপাবাজি করা এসব যেন এখন প্রায় সবার কাছে একদম সাধারণ ব্যাপার। পরিবার ও সমাজের চারিদিকে শুধুই বিশৃংখলা। সুখ শান্তি যেন অধরা। সুখ শান্তিতে ভরপুর পরিবার দেখা বা পাওয়া যেন সোনার হরিণ। কেন এসব হচ্ছে আমরা যদি তার উত্তর খুঁজতে যাই তাহলে প্রধান যে কারণটি পাওয়া যাবে তা হচ্ছে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়। মুল্যবোধের চর্চা নেই বললেই চলে। সকলেই মনে হয় আমার সাথে এ বিষয়ে একমত হবেন।

আমাদের সমাজে কেন নৈতিকতা ও মূল্যবোধের এই অবক্ষয় তা যদি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে বর্তমানে আমরা সকলে ভোগবাদে বিশ্বাসী হয়ে সেইমতো জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, এর চাকচিক্য আমাদেরকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করছে। আমাদের পরিবারগুলোতে নিজেরা ও সন্তানরা যেন ভোগবাদী জীবনের প্রতি একটু বেশিই ঝুঁকে পড়ছি, আমরা বাস্তববাদী ও সাধারণ জীবন এর প্রতি উৎসাহী নই। অল্পতে আমাদের মন সন্তুষ্ট হয় না। সঠিক ও সুন্দর মূল্যবোধের চর্চা পরিবারগুলোতে নেই বললেই চলে। কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে সুন্দর ও শান্তিময় জীবন আমরা আমদের জীবন থেকে হারিয়ে ফেলবো। কাজেই আমাদের এখন থেকেই চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা সকলে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের চর্চা অব্যাহত রাখি এবং যেহেতু পরিবার নৈতিকতা এবং মূল্যেবোধের গঠনের সুতিকাগার সেহেতু পরিবারের সকল সদস্যের বিশেষ করে ছেলে মেয়েদের গঠনের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

একজন শিশু জন্মের পর এই পরিবারে থেকেই জ্ঞানে-বুদ্ধিতে, বয়সে, শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধে বেড়ে ওঠে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বাসবর্ষে পরিবার দিবস উপলক্ষে তার বাণীতে বলেছেন, "পরিবার হচ্ছে পৃথিবীর আলো ও লবণ, যা সম্পর্ককে দৃঢ় করতে সহায়তা করে। তিনি আরো বলেন, প্রতিটি পরিবারে তোমরা সবসময় নাজারেথের পবিত্র পরিবারের মত সাধারণ ও বিশ্বাসপূর্ণ জীবন যাপন কর।"

পরিবারের সন্তান হচ্ছে পরিবারের ফসল, পরিবারেই প্রতিটি শিশু নেয় তার জীবনের মূল্যবোধ রচনার প্রথম পাঠ এবং সেইসাথে জীবনের বাস্তবতা, আচার আচরণ এবং পৃথিবীকে মোকাবেলা করার সাহস, ক্ষমতা সবই শিখে পরিবার থেকে কাজেই এক্ষেত্রে পরিবারের সকলকে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহমর্মী হতে হবে। ছোট বড় প্রত্যেকে যেন পরিবারে একটি মর্যাদার পরিবেশ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে, সকলের অবদান যেন হয় স্বীকৃত। বিশেষ করে পরিবারে নারীর অবদান এর মর্যাদা দিতে হবে। সকলের প্রতি সুন্দর ও সহনশীল ও ভালবাসা পূর্ণ আচরণে আমাদের খ্রিস্টীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রকাশ হবে। স্বামী স্ত্রী একে অন্যকে ভালবাসতে হবে পরিপূর্ণভাবে। একে অন্যের দূর্বলতাকে সহনশীল দৃষ্টিতে দেখতে হবে। পরিবারের শিশুরা যেন বাবা মায়ের মধ্যে স্বর্গীয় শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রেম ও ভালবাসা দেখতে পায় এবং তা নিজেদের হৃদয়ে ধারণ করতে পারে সে বিষয়ে নিশ্চিত করতে হবে যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে সহায়ক হবে।

একজন ব্যক্তির পরিবার কেমন তা তার ব্যবহার, মূল্যবোধ গঠনে ও আচরণ দেখেই বুঝা যায়। একটি পরিবারে শিশু যে মূল্যবোধ ধারণ করে তাই নির্ধারণ করে যে তার আচরণ কেমন হবে। পারস্পরিক সম্পর্ক, সমঝোতা, ভালোবাসা, আবেগ, অনুভূতি এসবের উপর ভিত্তি করেই পারিবারিক মূল্যবোধগুলো গড়ে উঠে। এক একটি পরিবারের মূল্যবোধ একেক রকমের। পরিবারে মূল্যবোধ গঠনের উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া উচিত। কারণ পরিবারের কোন সদস্য যখন কোন সমস্যা বা কষ্টকর অনুভূতির মুখোমুখি হয় তখন পারিবারিক এই মূল্যবোধগুলো তাকে সহায়তা করে সঠিক পথটি বেছে নেয়ার জন্য। সে একা অনুভব করে না কারণ সে জানে পুরো পরিবার তার সাথে রয়েছে, সে ভেঙ্গে পড়ে না এগিয়ে যায় আশা নিয়ে। জীবনের কঠিন সময়ে তাকে সঠিক পথ দেখায় তার নৈতিকতা ও মূল্যবোধ কারণ এর মাধ্যমে সে একটি শক্ত ভিত্তি তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলো আমাদের মূল্যবোধ চর্চার ফল।

একটি খ্রিস্টীয় পরিবারে যে বিষয়গুলোর যত্ন বিশেষভাবে করতে হবে সন্তানকে সঠিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়ার জন্য:

- স্বামী স্ত্রী সন্তান সন্ততিসহ পরিবারে পবিত্র জীবন যাপন করে পারিবারিক বন্ধনকে মজবুত করে গড়ে তোলা। পরিবার যেন হয় ভালবাসার আশ্রয়স্থল। সন্তানদের খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে গড়ে তোলা পিতামাতা হিসাবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সন্তানদের সামনে খ্রিস্টকে আমাদের একমাত্র "আদর্শ" হিসাবে তুলে ধরতে হবে। নিজ নিজ পরিবারটিকে নাজারেথের

যিশু মারীয়া যোসেফের পরিবার এর আদলে গড়ে তোলা। একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমাদের অনুসরণীয় হতে হবে। খ্রিস্টবিশ্বাসীরূপে যেন জীবন-যাপন করি এবং খ্রিস্ট বিশ্বাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করি। মাণ্ডলিক সেবাকাজে অংশগ্রহণ করি এবং খ্রিস্টীয় জীবনের পবিত্রতার আহ্বানে সাড়া দেই।

- পরিবারে রয়েছে বিভিন্ন বয়সের মানুষ, নারী পুরুষ, ছেলে-মেয়ে। পরিবারের সকলের জন্য একটি পরিচিতি ও সম্মানের স্থান তৈরী করতে হবে। এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে পরিবারের প্রতিটি সদস্য অনুধাবন করতে পারেন যে, আমি এই পরিবারের একজন সম্মানীয় সদস্য এবং আমার পরিবারের প্রতি পূর্ণ আস্থা রয়েছে, আছে ভালোবাসার পূর্ণ অধিকার। সকলকেই যার যার প্রাপ্য মর্যাদা দেয়া, একে অন্যকে গ্রহণ করার মানসিকতা, অন্যের মতামতকে প্রাধ্যান্য দেয়ার ধৈর্য্য ধারণের শিক্ষা পরিবারে থাকতে হবে।
- পরিবারে মায়ের অর্থাৎ নারীর অবদানকে যথাযথ মূল্যায়ন করা এবং নারীর পাশাপাশি পরিবারের প্রতিটি পুরুষকে পরিবারের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হবে।
- আমাদের পরিবারে যেন প্রার্থনাপূর্ণ পরিবেশ থাকে এবং সকলে প্রার্থনায় মনোনিবেশ করে তা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের পারিবারিক প্রার্থনা, প্রতি সন্ধ্যায় রোজারিমালা, রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে যোগদান, প্রয়োজন ও কতৃজ্ঞতা স্বরূপ প্রার্থনা নিশ্চিত করণের মাধ্যমেই আমরা আমাদের পরিবারে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারি ।
- প্রতিটি পরিবারের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পরিবারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একটি নির্দেশিকা তৈরি করা যায় এবং নির্দেশিকায় পরিবারের প্রতিজন সদস্যের জন্য নির্ধারিত ভূমিকা থাকবে। উক্ত নির্দেশিকায় যার জন্য যে কাজ নির্ধারিত থাকবে সে সেই কাজ সঠিকভাবে পালন করবে। ঘরের কাজে ছোট বড় সকলে অংশগ্রহণ করবে। অনেক সময় একজন বা দুজনে পরিবারের সকল কাজ শেষ করে অন্যদিকে বাকী সদস্যরা কাজগুলো এড়িয়ে যায় বা অলসতা করে, ফলে পরিবারের অনেকে বিশ্রামের কোন সুযোগই পায় না। পরিবারে সকলে একসঙ্গে কাজ করলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, বিশ্বস্ততা ও আনন্দ বৃদ্ধি পায়। গৃহকর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের সন্তানদের মধ্যে আমরা দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে পারি।
- পরিবারে যাকে যে কাজটি দেয়া হচ্ছে সেই কাজকে প্রাধান্য দিয়ে আনন্দের সঙ্গে কাজটি করতে হবে। পরিবারের ছোট শিশুদের মধ্যেও ধারণাটি দিতে হবে যে, পরিবারে তারাও অবদান রাখতে পারে। তার যে কাজটি করতে ভাল লাগে, অর্থাৎ সে যেন আনন্দের সঙ্গে কাজটি করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা আবশ্যক। আর প্রতিটি কাজ শেষ হলে তাকে উৎসাহ দেয়াও জরুরি। নিজে কাজে অংশগ্রহণের মাধমে শিশুরা পরিবারের অন্যদের কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারবে এবং ক্রমে ক্রমে সে দায়িত্ববান হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে একজন সুযোগ্য সেবাকর্মী। এভাবেই তার মধ্যে পারিবারিক মূল্যবোধ গড়ে উঠবে যা তার পরবর্তী জীবনের ভিত্তি।
- পরিবারে শূধুমাত্র কাজ ভাগাভাগি করলেই হবে না, আনন্দের ভাগাভাগিও করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিবারের সকলের বিশেষ দিবসগুলো যেমন: জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, যে কোন অর্জনের দিন সকলে একসঙ্গে উদ্‌যাপন করা যায়। এমনকি এই আনন্দের অংশীদার হিসেবে পরিবারের সাহায্যকারীর কোন বিশেষ দিন উদ্‌যাপন করতে পারি। এর ফলে একের প্রতি অন্যের ভালবাসা ও অনুভুতি প্রকাশ পায়। পরিবারে সকলে মিলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আনন্দ সহকারে আহারের মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধনকে আরো দৃঢ় করা যায়। এর ফলে আমরা সহমর্মী ও রসবোধসম্পন্ন হয়ে উঠি।
- পরিবারে বাবা মার মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের পরামর্শমত কাজ করা এবং দায়িত্ব পালন করা যেমন পরিবারের বিশেষ দিনগুলোতে, বিপদের সময়গুলোতে, প্রয়োজনের সময় সকলের উপস্থিতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে ও ভূমিকা যথাযথভাবে পালনের মধ্যদিয়ে বাধ্যতার চর্চা করতে পারি।
- পরিবারে আমরা অনেক সময়ই একজন আরেকজনের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনি না। বিশেষ করে শিশুদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনার প্রয়োজন বোধ করিনা। শিশুরা অনেক উৎসাহ, উত্তেজনা নিয়ে তাদের কথা বলতে আমাদের কাছে আসে কিন্তু তাদের কথা যদি আমরা গুরুত্ব সহকারে না শুনি তাহলে তারা আমাদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। পরিবারের একে অন্যের প্রতি আস্থা থাকা জরুরি। পরিবারে কোন সদস্য যেন নিজেকে অযাচিত না ভাবে সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। একে অন্যের কথা মন দিয়ে শোনার মাধ্যমে আমরা একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস আস্থা ও উদারতা দেখাতে পারি।
- পরিবারে একসঙ্গে প্রার্থনা করতে হবে। কারণ প্রার্থনাই আমাদের শক্তি যোগায়, আমাদের আত্মবিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি আস্থাকে অবিচল রাখে। বিভিন্ন বাধা বিপত্তিতে আমরা পরিবারের সকলে যেন একসঙ্গে থাকি। পরিবারে অনেক সময় কিছু দুঃখের সময় পার করতে হয়। একের পর এক বিপদ যেন শেষ হতে চায় না। আমরা অনেক সময় একে অন্যের প্রতি হিংসা করি, কাউকে ক্ষমা করতে চাইনা কিন্তু বিপদের সময়গুলোতে যেন আমরা পরিবারে একে অপরের আস্থার স্থল হয়ে পাশে থাকি, একে অন্যকে ক্ষমা করি। আমার পরিবার আমাকে কখনো বিমুখ করবেনা বরং আমার পাশে থাকবে এই বিশ্বাস যেন আমরা অর্জন করতে পারি।

বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে যে বিষয়টির প্রয়োজন বোধ করা যায় তাহলো 'শান্তি'। আমরা আমাদের পরিবারে যেন শান্তির বীজ বপন করতে পারি। পরিবারের প্রতিটি সদস্য যেন হয়ে উঠি শান্তির বাহন। কয়েকদিন আগে কাজের সূত্রে একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেখানে "শান্তি ও নিরাপত্তা" বিষয়ে আলোচনা চলছিল। আলোচনার একপর্যায়ে সেমিনারের মূল আলোচক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে একটি প্রশ্ন করলেন, যে আমরা দিনের শেষে আমাদের পরিবারের জন্য কি নিয়ে যেতে চাই? এক বাক্যে সকলেই বলল 'শান্তি'। আমরা সকলে নিজের পরিবারের সবাইকে নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে চাই। আমাদের সকলকেই মনে রাখতে হবে পরিবারই আমাদের ইহজীবনে শান্তির ও সুখের জায়গা। আমাদের সকল কাজের পরে দিনশেষে পরিবারে ফিরে আসতে চাই এবং সকল কাজ করি পরিবারের সুখ-শান্তির জন্য এবং আমরা পরিবারে, সমাজে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে সুন্দর ও সঠিক মুল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে যার বর্তমান সমাজে বড়ই অভাব। আর এই মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ গড়তে এখনো কোন ধরনের যন্ত্র/মেশিন উদ্ভাবন হয়নি আর অদূর ভবিষ্যতে হবেও না। পরিবারই হতে পারে সেই যন্ত্র/মেশিন, আর কারিগর হচ্ছে পিতামাতা ও অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠরা। পরিবারের সকলেই চেষ্টা করি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা করে সন্তানদের সমাজের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে, তাহলেই আমরা পাবো সেই শান্তির পৃথিবী॥

খোলা জানালা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে খ্রিস্টান সংস্কৃতিসেবী ও শিল্পীদের ভূমিকা

ডা: নেভেল ডি'রোজারিও

ভূমিকা:

একাত্তরের ২৫ মার্চের কালো রাত্রিতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পরিচালিত Operation Searchlight এ পৃথিবীর ভয়ংকরতম গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বাঙালি-আদিবাসী নির্বিশেষে বাংলাদেশের নিরীহ জনগণ হাতে তুলে নেয় অস্ত্র, সারা দেশজুড়ে গড়ে তুলে প্রতিরোধের বাংকার। শুরু হয় হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, সমতল ভূমির বাঙালি আর পাহাড়িয়া এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠির সম্মিলীত জনযুদ্ধ মুক্তির লড়াই তথা স্বাধীনতা সংগ্রাম।

পাকিস্তানী শাসন, শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ও আমাদের সবার ত্যাগের বিনিময়ে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে স্বাধীন বাংলাদেশ জনযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত। হিন্দু , বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান সমতলের বাঙালি ও পাহাড়ী আদিবাসী সবার মিলিত সংগ্রামের ফলে গড়ে উঠেছিল ধর্মনিরপেক্ষ গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বপ্ন। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠির মাত্র ০.০৩ শতাংশ (০.০৩%)। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সম্মিলীত এ জনযুদ্ধে বিশেষ কোন ধর্মবিশ্বাসের কারণে তা আলাদা ভাবে উল্লেখের সুযোগ না থাকলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশসেবায় অনুপ্রেরণা ও আগ্রহী করার জন্যে মহান মুক্তিযুদ্ধকালে ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খ্রিস্ট-বিশ্বাসীদের অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

বাঙালির গর্ব সমর দাস- সংগীত জগতের এক কিংবদন্তী নাম। সুরের যাদুকর, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক ও প্রধান সংগীত পরিচালক, শব্দ সৈনিক, সংগীত ব্রিগেড কমান্ডার ও কণ্ঠ-যোদ্ধা, বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে লন্ডনে গিয়ে, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের সুরবিন্যাস ও সামরিক ব্রাশ ব্যান্ডে রেকর্ড করার দায়িত্ব পালনকারী মুক্তিযোদ্ধা সমর দাস ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ১০ ডিসেম্বর ঢাকার লক্ষীবাজারে এক খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

সমর দাস সংগীত জগতের বিভিন্ন শাখা ও উপাদান এর রংয়ের মিশ্রণে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিকভাবে সংগীতের বিশাল এক ক্যানভাসে এক অপূর্ব পেইন্টিংসম সুরমঞ্জরী সৃষ্টি করেছিলেন আর সে বিশাল ক্যানভাস থেকে বিশাল মাপের সমর দাসকে মনের ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষুদ্রতায় জোর করে ছোট বোতলে ভরে মিনিয়েচার পেইন্টিং এ পরিণত করার ধৃষ্টতা ও ইচ্ছা আমার কখনো ছিল না।

আমার মতে সমর দাসের যথার্থ পরিচয় হল উনি প্রথমত ছিলেন প্রচণ্ডভাবে মানুষ, দ্বিতীয়ত জাতিগতভাবে বাঙালি, তৃতীয়তঃ ভৌগোলিকগত ভাবে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি দলে হয়েছেন বাংলাদেশী এবং সবার শেষে ধর্মীয় বিশ্বাসে ছিলেন খ্রিস্টান। জাতিগতভাবে বাঙালি তাইতো তাকে খুঁজে পাই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে একাত্তরের মার্চের সে উত্তাল দিনগুলোতে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের মিছিলে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহূত অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে তিনি লোভনীয় রেডিও পাকিস্তান ও টেলিভিশনের চাকুরী/ সুবিধা ছেড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যোগ দেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। কেন্দ্রের মূখ্য সংগীত পরিচালক হিসেবে স্বাধীনতা যুদ্ধের শব্দ সৈনিক হিসেবে তার সুরারোপিত অসংখ্য গান প্রচণ্ডভাবে সম্মুখ সমরে অংশ গ্রহণকারী অকুতোভয় মুক্তিবাহিনীর বীর সেনানীদের ও সাথে সাথে উজ্জীবিত করেছে সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী বাঙালিকে। 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য্য উঠেছে রক্ত লাল, রক্ত লাল', 'নোঙ্গর তোল তোল, সময় যে হল হল' অথ বা 'ভেবো নাকো মা তোমার ছেলেরা হারিয়ে গিয়েছে পথে' সহ অসংখ্য চেতনামূলক কালজয়ী গানের তিনি সার্থক সুরকার। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন সময়ে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হয়ে আবার কোন সময় দলনেতা হিসেবে বিদেশে পরিচিত হয়েছেন ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশী পরিচয়ে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সমর দাসের সঙ্গীত পরিচালনায় কোলকাতার HMV মুক্তিযুদ্ধ সময়কার ২৬ টি গানের লং প্লে-রেকর্ড 'বাংলাদেশের হৃদয় থেকে' বের করে।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা পোপ ষষ্ঠ পল ম্যানিলা যাবার পথে ঢাকা এয়ারপোর্টে মাত্র ১ ঘন্টার যাত্রাবিরতিতে নেমেছিলেন। সুহৃদ সংঘ রাত ১ টায় পুরাতন তেজগাঁও এয়ারপোর্টে লক্ষীবাজার খ্রিস্টভক্তদের আনা নেবার জন্যে কিছু বাস ভাড়া করে। সমর দাসও সেদিন ছিলেন সাথে। মাত্র ১ ঘন্টা যাত্রাবিরতির প্রসঙ্গ তুলে আলাপ প্রসঙ্গে তিনি জানালেন 'আজ যদি খ্রিস্টানদের একটি সংগীত একাডেমী বা প্রতিষ্ঠান থাকতো তাহলে ১০০ টি ছেলে-কণ্ঠ ও ১০০ টি মেয়ে-কণ্ঠের সমন্বয়ে আরও ১০০ বাদক দল নিয়ে আমরা মহামান্য পোপ মহোদয়কে বিমান বন্দরে বা বেশী সময় পেলে ষ্টেডিয়ামে ইউরোপীয় চার্চ মিউজিক, ল্যাটিন সুর ও তার সাথে যোগ করতে পারতাম দেশজ খ্রিস্টীয় সংগীত চেতনা'। এ যেন সর্বজনগ্রাহ্য সামাজিক অনুষঙ্গ মেশানো মৃত্তিকা লগ্নতায়-আপন স্বকীয়তার তার স্বকীয় বৈশিষ্টময়তা। সমর দাসের মত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব খ্রিস্টান সম্প্রদায় বা সারা বাংলাদেশে আগামী শতকে আসবে কিনা জানিনা। ধর্মীয় বিশ্বাসগত হিসেবে আমরা বাংলাদেশের জনসংখ্যার মাত্র ০.০৩%। আমাদের সংখ্যার অনুপাতে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অংশগ্রহণ ও অবদান কিন্তু শতক গুণ। আমরা অবিবেচকের মত যুদ্ধ শেষের প্রাপ্য দাবী করছি না। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি' এ শ্লোগানে ও লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এবং আমাদের সবার ত্যাগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের আহ্বানে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ সম্মিলিত জনযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত। তাই আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

জন্ম শতবর্ষে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট দাবী জানাই কিংবদন্তী সুরকার, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠশিল্পী ব্রিগেড প্রধান, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় সংগীত অর্কেষ্ট্রায়েশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সমর দাসের অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তার মরদেহ ওয়ারী কবর স্থান থেকে বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে স্থানান্তরকরণের যাবতীয় ব্যবস্থা নেবেন।

'৭১ এর বিক্ষুব্দ ও সংগ্রামী শিল্পী সমাজের চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক যোদ্ধা খ্রিষ্টফার এম রোজারিও:

বর্ধমানের আনোখা গ্রামে জমিদার পরেশ মুখার্জির বংশোদ্ভূত সুনীল মুখার্জি, ডাক নাম গোপাল। চার কন্যা খ্রিস্টিনা, ক্ল্যারা, সিসিলিয়া, ক্যাথেরিনার পিতা আজকের আলোচিত ব্যক্তি খ্রিষ্টফার এম রোজারিও (সি এম রোজারিও নামে অধিক পরিচিত)। বাবা জমিদার নরেন্দ্র মুখার্জির পৃষ্ঠপোষকতায় জমিদারীতে গড়ে ওঠে নাটকের দল। শিশু সুনীল অবাক চোখে জমিদার পিতা নরেন্দ্র মুখার্জিকে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখতেন, সে সময়েই নাটকের পোকা ঢুকে যায় মাথায়। অংশ নেন কোলকাতার বহুরূপী নাট্যদলের 'ছেঁড়া তার', 'দূখের ইমান' নাটকে। বঙ্গবাসী কলেজে পড়বার সময় কোলকাতার সুরেন ব্যানার্জি রোডের বিশাল বাড়ীর ছাদে প্যান্ডেল করে নাটকে মেতে ওঠেন যুবক সুনীল। সে সময়ে তিনি 'বেস্ট নাইন' দলে ভলি খেলতেন, ফুটবল খেলতেন ভবানিপুরের হয়ে।

১৯৪৫ এর পরবর্তীতে ভেঙ্গে পড়া জমিদারির আভিজাত্যের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে কিশোর সুনীলের মাথায় ঢুকে সাম্যবাদ, চোখে স্বদেশ স্বপ্ন আর হৃদয়ে সুভাস বোস। তিনি সকল বৈভব, সমস্ত প্রতিপত্তি উপেক্ষা করে ১৯৫০ তে ছাড়লেন কোলকাতা, অবশ্যি এর আগে ফুটবল খেলতে ঢাকায় এসেছিলেন একবার। ১৯৫০ থেকে ৫৩ কাটিয়ে দিলেন ঢাকায়। ১৯৫৪ তে চলে এলেন চট্টগ্রামে জার্মান বহুজাতিক কোম্পানীর উচ্চপদে আসীন হয়ে। চট্টগ্রামে মুসলিম ইন্সটিটিউট উদ্বোধনীতে তার পরিচালনায় নাটক মঞ্চস্থ হয় নজরুল ইসলামের 'সাপুড়ে', নায়িকা ছিলেন তন্দ্রা ভট্টাচার্য। সে বছরেই মমতাজুদ্দিন আহমদের 'সাগর থেকে ফেরা' নাটকটি পরিচালনা এবং নাটকে অভিনয় করেন তিনি। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্ট ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে খ্রিস্টাবলম্বী হ'বার মানসে দ্বারস্থ হন কাথলিক মণ্ডলীর। ৪ বছর খ্রিস্ট ধর্মমতকে আরো ভালভাবে জেনে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে খ্রিস্ট অনুসারী হয়ে নাম ধারণ করেন খ্রিষ্টফার মনোহর রোজারিও।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টাঙ্গাইল জেলার কাগমারী নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয় কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন। আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী। আওয়ামী লীগের সে সম্মেলন ছিল একটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী জাতীয় সম্মেলন যা পরবর্তীতে পাকিস্তানের বিভক্তি ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশেষ ইঙ্গিতবহ ভূমিকা রেখেছিল। সমাজ সচেতন সংস্কৃতিমনা সি এম রোজারিও সে সম্মেলনে অংশ নিলেও পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি নিয়ে আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বেশী করে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে সকল রাজনৈতিক বাধা পেরিয়ে রবীন্দ্র শত বার্ষিকী তে 'সোনার তরী' নাটকে অভিনয় করেন। এরপর চট্টগ্রাম রেলওয়ে কলোনীর ওয়াজিউল্লাহ মঞ্চে করেন বহু নাটক । ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'এরাও মানুষ' নাটকের পরিচালনা করেন এবং সে নাটকে শিশু পুত্রের ভূমিকায় অভিনয় করান মিনা পাল অর্থাৎ পরবর্তীকালের চিত্র নায়িকা কবরী সারোয়ারকে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রবর্তক সংঘের হয়ে নাটক 'এবার ফিরাও মোরে' পরিচালনা করেন। এ নাটক মঞ্চায়ণের বিশেষত্ব ছিল এ নাটকে তিন উচ্চতায়, তিন ধাপের স্টেজে একই সঙ্গে তিনটি পর্ব অভিনীত হয়। এরপর সমমনাদের নিয়ে ক্রান্তি সংঘ গড়ে তোলা হয় যা রাজনৈতিক কারণে ভেঙ্গে পড়েছিল। পরে গড়ে তোলা হয় জাগৃতি সংঘ সেখান থেকেই সব চেয়ে বেশি নাটকে অভিনয় ও নাটক পরিচালনা করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ কোম্পানী জেমস ওয়ারেনের প্রযোজনায় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট নাটকটি মঞ্চস্থ হয় এ এস মন্ডলের উদ্যোগে। প্রিন্স হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে তিন মাস তলোয়ার চালানোর প্রশিক্ষণ নেন। এর পরেই আসে একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সে মাহেন্দ্রক্ষণ। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেন নাটককে সঙ্গী করে।

পাড়ায় পাড়ায় অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতেন। অভিনয় করেন মমতাজ উদ্দিন আহমেদের লেখা 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম' সহ বহু নাটকে, কখনো খোলা মাঠে, কখনো ট্রাকের ওপরে। বাঙালিয়ানা পত্রিকাতে ফ্লোরিডায় শেষ জীবনে বসবাসকালে বিশিষ্ট নাট্যকর্মী সি এম রোজারিও তার প্রকাশিত আত্মকথনে বলেছিলেন যে কথা তার অংশবিশেষ এখানে তুলে দিলাম;

"২৪ মার্চ চট্টগ্রাম কলেজের মাঠে (প্যারেড মাঠ) মমতাজ উদ্দীনের লেখা "স্বাধীনতার সংগ্রাম" যখন মঞ্চস্থ হচ্ছিল তখন শেষের দিকে খবর এলো বন্দরে পাকিস্তানী জাহাজ "সোয়াত" এসে ভিড়েছে প্রচুর গোলাবারুদ আর মারণাস্ত্র নিয়ে এবং সেগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ক্যান্টনমেন্টে। রক্তে আমাদের দামামা বেজে উঠলো। আমরা নাটক চালিয়ে যাচ্ছি। এ নাটকে আমার চরিত্র ছিল একজন যুবক গায়কের। এই যুবকের মুখ দিয়েও লেখক হানাদারদের প্রতি ঘৃণা আর ক্রোধ প্রকাশ করেছেন, শত্রুদের মুখে থুথু ছিটিয়ে দিতে চেয়েছেন। অকুতোভয় যুবক মৃত্যুর ভয় না করে উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করেছে

'মহা বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে
বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে
রণিবে না-
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত'।

আমি আবৃত্তি শেষ করেছি, পরের দৃশ্যে পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাকে টেনে হিচড়ে মঞ্চের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে খুন করার জন্যে ঠিক সেই সময় দর্শকদের মধ্যে থেকে বেশ কিছু জুতো এসে পড়লো মঞ্চে। এ ছিল হানাদারদের বিরুদ্ধে মানুষের রাগ আর ঘৃণার নিদর্শন। আমাদের সাফল্যের নিদর্শনও। ,,,,,, এখন প্রবাস জীবন যাপন করছি। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নিয়েছি। দেশের খবরের জন্যে মন উদগ্রীব হয়ে থাকে। কোথাও একটু সাফল্যের খবর পেলে বড্ড ভাল লাগে। ..... ঘুম থেকে উঠে ভুলে যাওয়া স্বপ্নের মত মাঝে মাঝে ৭১ এর খুটিনাটি মনে করার চেষ্টা করি। তাতে মন আরো আবেগাক্রান্ত হয়। দীর্ঘশ্বাস গুলো আরো একটু দীর্ঘ হয়"।

'পতিব্রতা' , 'এরাও মানুষ', 'ক্ষুধা', 'মৃত্যু ক্ষুধা', 'রুপালী চাঁদ', 'ছেলে কার', 'কাজে কাজে সুতরাং' , 'বিয়ে করলে টাকা' - এমন

বহু বহু নাটকে অভিনয় আর পরিচালনা করেছিলেন।

পরিবার ছিল খৃষ্টফার ও লীলা রোজারিও'র মুখ্য। তারা চলে গিয়েছেন না ফেরার দেশে, দিয়ে গেছেন তাদের চার মেয়েদের একটা আদর্শিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে নান্দনিকতার পাঠ দিয়ে। আত্মপ্রচার বিমুখ সি এম রোজারিও ৮৫ বছর বয়সে ২০১৫ তে চলে গেছেন মেয়েদের ছেড়ে। কিন্তু শিখিয়ে গেছেন কবিতা ভালোবাসতে, আবৃত্তি করতে, শিখিয়েছেন সাংগঠনিক হতে, ছবি তোলা , ডার্ক রুমে ছবি ডেভালাপ করা, আর শিখিয়েছেন ব্যারেল ২. ২ বন্ধুক আর রাইফেল চালাতে।

মুজিবনগরে বাংলাদশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের বাইবেল পাঠক ও জাতীয় সংগীতের গায়ক-শিল্পী ষ্টিফেন পিন্টু বিশ্বাস ।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে গঠন করা হয় প্রথম বাংলাদেশ সরকার। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ১৭ এপ্রিল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার তখনকার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথ তলার এক আম বাগানে নবগঠিত মন্ত্রি পরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

১০ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করা হয় । ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে বৈদ্যনাথ তলার এক আমবাগানে মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। দেশী-বিদেশী প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বেলা ১১টায় কোরআন তেলাওয়াত, গীতা ও বাইবেল পাঠ এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং শুরুতেই বাংলাদেশকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' রূপে ঘোষণা করা হয়। পতাকা উত্তোলনকালে অনুষ্ঠানে পরিবেশিত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটির গায়ক দলে সমবেত কণ্ঠে অংশ নিয়েছিলেন ভবেরপাড়া কাথলিক মিশনের যুবক, নটরডেম কলেজের তৎকালীন ছাত্র ষ্টিফেন পিন্টু বিশ্বাস। কোরান তেলাওয়াত, গীতা পাঠের পরে বাইবেল পাঠ করেন ষ্টিফেন পিন্টু বিশ্বাস।

সেদিনের সে মাহেন্দ্রক্ষণের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আপ্লুত হয়ে শপথ অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত সাক্ষী, গায়ক ও বাইবেল পাঠক ষ্টিফেন পিন্টু বিশ্বাস জানান, "বাগানের অংশ বিশেষ পরিষ্কার করতে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন Sisters of Charity of Maria Bambina সম্প্রদায়ের সিস্টার ও তাদের পরিচালিত Orphanage এর কিছু মেয়ে। যাত্রা ও নাটক আয়োজনের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকাতে মঞ্চ তৈরীর পুরো দায়িত্ব চলে আসে আমার উপর। মোট ৪ খানা চৌকি দিয়ে তৈরী করা হয় মঞ্চ, যার দু'খানা আনা হয়েছিল তার দুলা ভাই (বড় খোকা হিসেবে পরিচিত) মনোরঞ্জন হালসনার নিকটস্থ বাড়ী থেকে"।

জাতীয় সংগীত গাইবার প্রস্তুতিতে কারা গাইতে পারে জিজ্ঞাসিত হলে পিন্টু বিশ্বাস এগিয়ে আসেন এবং গির্জা থেকে হারমোনিয়াম নিয়ে আসেন। শপথ স্থলের একটু দূরে গাছতলায় স্থানীয় কয়েকজন শিল্পী নিয়ে গানটি প্র্যাকটিস করা হয়। অনুষ্ঠান শুরুতে তৎকালীন ঢাকার Hotel Intercontinental এর একটি ব্যাংকের (বর্তমানকালের সোনালী ব্যাংক) এর Branch AGM শামসুদ্দীন সেন্টু'র পরিচালনায় গাওয়া হয় 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। এরপর কোরান তেলাওয়াত, গীতা পাঠের পরে বাইবেল পাঠ করার জন্যে হঠাৎ করে বলা হলে পিন্টু বিশ্বাস কাছের এক খ্রিস্টান বাড়ীতে বাইবেল না পেয়ে ও মিশন পর্যন্ত যাবার সময় না থাকাতে বাইবেল পাঠের ক্ষণ এলে পিন্টু বিশ্বাস ক্রুশের চিহ্ন করে শুরু করেন "বাইবেলে বর্ণিত আছে যিশুর এক শিষ্য যিশুকে প্রার্থনা করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে যিশু পিতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করার প্রভুর প্রার্থনা শিখিয়ে দেন বলে শুরু করেন, 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিত, তোমার নাম পূজিত হোক, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক... পুরো প্রার্থনা বলে শেষ করেন। সেদিন বাইবেল পাঠ করেছিলেন ষ্টিফেন পিন্টু বিশ্বাস কিন্তু স্থানীয় আওয়ামী লীগ এক নেতা মোমিন চৌধুরী বলে বেড়ায় ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ বাইবেল পড়েছিলেন। কিন্তু ফাদার ফ্রান্সিস সে সময় প্রৈরিতিক কাজে বল্লভপুর ছিলেন এবং শেষ কালে শপথস্থলে আসেন। তাকে সম্মানের সাথে অভিষিক্ত উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

আনন্দের ও গর্বের বিষয় যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের উষালগ্নের সে মহতী ও ঐতিহাসিক ক্ষণে, তৎকালীন কুষ্টিয়া জিলার মেহেরপুরের তৎকালীন খুলনা ধর্মপ্রদেশের অধীন ভবেরপাড়া কাথলিক গির্জায় ব্যবহৃত চেয়ার, টেবিল, হারমোনিয়াম অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়েছিল। শপথ অনুষ্ঠানের ছবি গুলোতে গির্জার সে চেয়ার টেবিল গুলো দেখা গেলেও স্বাধীনতার পরে এ গুলোর কোনো ঐতিহাসিক মূল্যায়ন কেউ কোথাও কখনো করেনি। ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ এ চেয়ার টেবিলগুলোর ছবি গুলো তুলে রেখেছিলেন এবং চেয়ার টেবিলগুলো সযত্নে রক্ষাণাবেক্ষণ করেন।

বীর সেনানী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠসৈনিক, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ডেভিড প্রণব দাস।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠসৈনিক, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, লেখক ও সমাজ বিশ্লেষক, মুক্তিযুদ্ধ 'একাত্তরের যিশু' চলচ্চিত্রের প্রযোজক, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বাইবেল পাঠক কর্মবীর ডেভিড প্রণব দাস। ডেভিড প্রণব দাস ছিলেন একজন শব্দ সৈনিক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত বাইবেল পাঠ করতেন। স্বাধীনতার পরে নাসিরউদ্দীন ইউসুফের পরিচালনায় শাহরিয়ার কবীরের 'একাত্তরের যিশু'র কাহিনী নিয়ে প্রযোজনা করেন পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'একাত্তরের যিশু' Jesus ৭১. চলচ্চিত্রটি ব্যাপক ভাবে আলোচিত ও প্রশংসিত এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত।

খ্রিস্টীয় ধর্মীয় বিশ্বাস ও দর্শনকে শুধুমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন প্রচণ্ডভাবে আন্তঃমাণ্ডলিক এবং বিশ্বস্ত ছিলেন সৌহাদ্যপূর্ণ আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক উন্নয়নে। তার প্রতিটি কাজ পর্যালোচনা করে কাজের কুশীলবদের দিকে তাকালেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ডেভিড প্রণব দাস নিজেও ছিলেন একজন লেখক। তার সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা প্রকাশিত বই 'আনন্দধ্বনি' সুধি সমাজে সমাদৃত॥

খোলা জানালা

মুক্তিদাতার আগমন: মুক্তিযুদ্ধ প্রতিদিন

জন মংলা রোজারিও

বাইবেলে পাপ মুক্তির ইতিহাসে যিশুর ভূমিকা প্রধান ও অনন্য তাকে বলা হয় মুক্তি দাতা , এাণকর্তা, খ্রিস্ট, ঈম্মানুয়েল ইত্যাদি। আদি পুস্তকে বর্ণিত আদম হবার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যেমন পাপের আগমন হয় তেমনি যিশুর আগমনে সেই পাপ মোচনের ব্যাবস্থাও হয়। মুক্তি দাতার আগমন বিষয়ে যিশাইয়র ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ হয়েছে! *(যিঃ ৯ ঃ ৬-৭ ও ১১ঃ ১-৯ পদ)* আমাদের জন্য এক পুত্র দত্তক হইয়াছে তাঁর উপর দায়ুদের রাজত্বের কর্তৃত্ব অর্পিত হইয়াছে। অন্যদিকে যোসেফ ও মারীয়া নামক দম্পতির মাধ্যমে পবিএ আত্মার দ্বারা এক পবিত্র সন্তান জন্ম নিবে তাঁর নাম রাখা হবে যিশু যার অর্থ এাণকর্তা, মুক্তি দাতা।

যিশুর আগমন আমরা কিভাবে নিশ্চিত হই? যিশু তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন আমি কে এ বিষয়ে তোমরা কি বল? অনেক উত্তর আসে তার মধ্যে সঠিক উত্তরে শিমন পিতর বলেছেন আপনি সেই যিশু যার এ জগতে আসবার কথা ছিল *(মথি ১৬ঃ১৩-১৭)*। যিশু যে এসেছেন, তাঁকে দেখেছেন আরো এক জনের কাছে তা জানতে পারি তিনি হলেন জেরুসালেমবাসি শিমিয়োন, পবিত্র আত্মা তাকে দর্শণ দিয়ে বলেছেন যিশুকে না দেখা পর্যন্ত তোমার মৃত্যু হবে না, সত্যি যিশুর জন্মের পর যখন নাজারেথে মা বাবার সাথে নিয়ম অনুসারে নাম লেখাতে গেলেন তখন শিমিয়োনও সেখানে গেলেন এবং তাঁকে কোলে নিলেন আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, হে প্রভু, এখন তুমি তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় করিতেছ। *(লুক ২ঃ ২৫-৩২)*

যিশু নিজেও কিন্তু নিজ মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। শয়তান দ্বারা তিনবার পরিক্ষিত হয়েছেন তিনি *(মথি ৪: ১-১০ পদ)* পাপ কিভাবে পৃথিবীতে আসলো আদম হবার মাধ্যমে, ঈশ্বর তাদের শাস্তি দিল,আবার পাপ থেকে মুক্তির জন্য নিজেই তাঁর একমাত্র পুত্রকে মানুষেরে পাপ থেকে মুক্তির জন্য পাঠালেন। এটাই ছিল, যিশুর আগমনের কারণ আর এ জন্মদিনই হলো আমাদের জন্য বড়দিন। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে সেই যুদ্ধ চলমান ছিল আছে এবং থাকবে। দৈনিক জীবন যাপনে হাজারটা যুদ্ধের মধ্যে মাত্র কয়েকটা বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই যা আমরা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছি :

রোগ থেকে মুক্তি, টাকা পয়সার অভাব থেকে মুক্তি, পাপ থেকে মুক্তি, দুর্নীতি থেকে মুক্তি, হতাশা নিরাশা থেকে মুক্তি, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান এর অভাব থেকে মুক্তি, দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি, মাদকতা ভায়াগ্রার ছোবল থেকে মুক্তি, শিক্ষা বিভাগের হতাশা জনক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি, নানাপ্রকার ছলচাতুরী থেকে মুক্তি, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় হীনমন্যতা থেকে মুক্তি। প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগের দুর্নীতি থেকে মুক্তি, করোনার ভয়াল গ্রাস থেকে মুক্তি। লোভ লালসা থেকে মুক্তি ইত্যাদি থেকে মুক্তি এভাবে আরও হাজারটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু মানুষ এগুলি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু পড়ে রয়েছে গানের সেই কথা "নিথুয়া পাথাড়ে"।

বড়দিন আমাদের জন্য পবিত্র, আনন্দের, উপভোগের, ভালবেসে উপহার দেয়া নেয়ার, যিশুর মত ছোট বড় সবাইকে শ্রেণিমত সম্মান জানানোর দিন আর যোহন বাপ্তাইজা যুদেয়া এলাকায় নিজে উপস্থিত হয়ে যে ভাবে উপদেশ দিয়েছেন সেই মোতাবেক নিজেদের প্রস্তুত করি। তিনি বলেছেন মন ফিরাও, প্রভুর পথ প্রস্তুত কর কারণ যার আসবার কথা ছিল (মুক্তিদাতা) তিনি আসছেন *(মথি ৩:১-৩)*। তাহলে কিভাবে আমরা এ বড়দিনে মুক্তিদাতাকে প্রণাম জানাতে ও গ্রহণ করতে প্রস্তুত হতে পারি ... ? পারি এভাবে মন ফিরাও অর্থাৎ সমস্ত কুবুদ্ধি দেওয়া, কুকর্ম করা, হিংসা করা, জোরজবর করে জমিদখল করা, কাউকে কুপ্রস্তাব দেওয়া, সমাজে, এলাকায়, ব্লকে, বিচারে টাকার গরমে অতিরিক্ত প্রভাব খাটান, ইত্যাদি না করা, মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার দ্বারা, অতিরিক্ত লোভ লালসা ত্যাগ করে,অন্যের প্রতি অবিচার না করে তাদের ভালবাসা, সুপরামর্শ দেওয়া, গরীব দীনদুঃখীদের মুক্তহস্তে দান করা, নিজপাপের জন্য পাপস্বীকার করে আত্মা, মন অন্তর পরিষ্কার করে তারপর খ্রিস্ট যিশুকে গ্রহণ করা তবেই বলতে পারব খ্রিস্টকে পেয়েছি আপন করে। বড়দিন আসছে, আমরা গান গাব "এ প্রেম কলসে কলসে ঢালি তবু না ফুরায়" সতিই যদি প্রেম সবার মধ্যে থাকে তাহলে এ পৃথিবীটাই হবে স্বর্গ।

অতএব বাইবেলে সন্নিবেশিত আছে- ঈশ্বরের মনন, মানবের আস্থা, মুক্তির পথ, পাপীদের বিচার, বিশ্বাসীদের সুখ আনন্দ। তাই সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যই ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে আজকের এ বড়দিনে পাঠিয়েছেন। তাঁকে গ্রহণ করার জন্যই আমাদের দৈনন্দিন সংগ্রাম চলছে নিজ নিজ মৃত্যু দিন পর্যন্ত। ঈশ্বরের এ মহান মুক্তি কাজের জন্য তাঁর গৌরব করি॥

সহায়ক:

বাইবেল, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী